KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-70000

Record No.: KLMLGK 2007	Place of Publication: ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection: KLMLGK	Publisher: নাসির রহমান
Title: চতুরঙ্গ	Size: 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: ৫২/৫ ৫২/৬ ৫২/৭ ৫২/৮	Year of Publication: ভাদ্র ১৩৯৮ ॥ Sep 1991 আশ্বিন ১৩৯৮ ॥ Oct 1991 কার্তিক ১৩৯৮ ॥ Nov 1991 অগ্রহায়ণ ১৩৯৮ ॥ Dec 1991
	Condition: Brittle Good ✓
Editor: আবদুর রউফ	Remarks:

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯১

ম্যাক্স ম্যুলারের ভারতপ্রেম কতখানি ছিল তৎকালীন ভারতের জাতীয় বিকাশের সহায়ক, আর কতটাই বা ছিল এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আরো পাকাপোক্ত করে তোলার পক্ষে ক্রিয়াশীল? এই নিয়ে একটি অভিনব রাজনৈতিক সমীক্ষা উপস্থাপনা করেছেন অধ্যাপক অরবিন্দ পোদ্দার।

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী-কৃত নিবিড়, গবেষণাধর্মী, কৌতূহলোদ্দীপক, সুখপাঠ্য ধারাবাহিক রচনা, "ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির"।

সম্প্রতি চতুরঙ্গের পাতায় ভিকতোরিয়া ওকাম্পোকেন্দ্রিক রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারার যে সমালোচনা করেছিলেন গৌরী আইয়ুব তারই জবাবে এই ধারার প্রবর্তিকা কেতকী কুশারী ডাইসনের দীর্ঘ নিবন্ধ।

মহীয়সী বাঙালি রমণী বেগম রোকেয়ার জীবন-আলেখ্য নিয়ে গ্রন্থের আলোচনা করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

"মেঘনাদবধ কাব্য" বিষয়ে—একটি ভিন্নধারার গবেষণার মূল্যায়ন করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পবিত্র সরকার।

বাঙলা ভাষায় গাছের বই নিয়ে আলোচনা।

মানবমনে হিংসা প্রশমনে বিজ্ঞান ও সমাজের ভূমিকা নিয়ে সুচিন্তিত অভিমত।

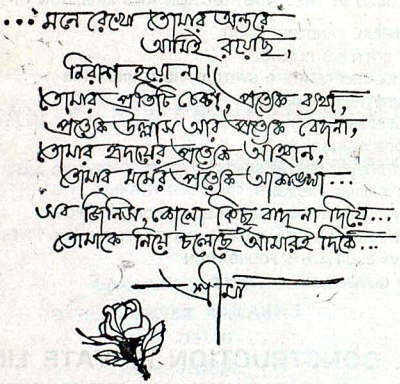

বর্ষ ৫২। সংখ্যা ৮
ডিসেমবর ১৯৯১
অগ্রহায়ণ ১৩৯৮

ম্যাক্স মুলারের ভারতপ্রেম : একটি রাজনৈতিক সমীক্ষা
অরবিন্দ পোদ্দার ৬০৫
ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির সুধীর চক্রবর্তী ৬২৩
আমার রবীন্দ্রনাথ-ভিক্তোরিয়া-বিষয়ক বইদুটির সূত্রে
কেতকী কুশারী ডাইসন ৬৪৮

সময়ের অদৃশ্য আড়ালে বিরাম মুখোপাধ্যায় ৬১৫
হাজার মুক্তোর স্বপ্ন সৈয়দ নুর হোসেন ৬১৬
কোমলধৈবত শান্তিকুমার ঘোষ ৬২০
সেদিন বিকেলে বিপ্লব মাজী ৬২১

পরিকল্পিত এক হত্যাকাণ্ডের মুহূর্তে নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৬৩৯

গ্রন্থসমালোচনা ৬৭২
অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, সুজিৎ ঘোষ,
সুনীলকান্তি ধর

মতামত ৬৮২
সিবাস্টিয়ান রোজারিও, তরুণ মুখোপাধ্যায়, অয়ন ব্যানার্জী, শেখ মনিরুল ইসলাম,
দেবব্রত ঘোষ, অরুণা হালদার, সুজিৎ ঘোষ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২১

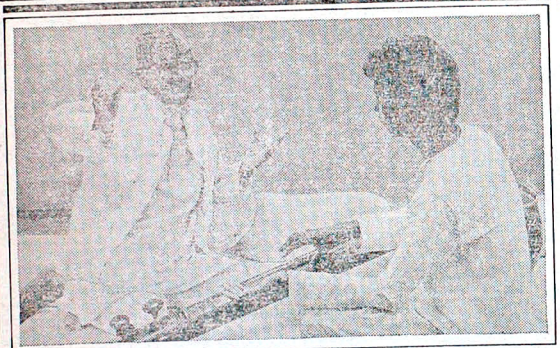

How ITC's Sangeet Research Academy created hope for Ustad Nisar Husain Khan.

In a tranquil corner of Calcutta, young Rashid Khan is beginning his *riyaz*. Guiding the prodigy from Badayun, Uttar Pradesh, along the *raga*, Ustad Nisar Husain Khan is filled with hope for the future. His century-old *tanpura*, now shaping Rashid's talent, symbolises the continuity that is the *guru-sishya parampara*. Under the spell of Rashid's song, Ustad Nisar Husain Khan's memory goes back to that day in 1978 when ITC came to his help....

Resident master-musicians have been nurturing latent talent at the Sangeet Research Academy, established by ITC with the express purpose of reviving the *guru-sishya parampara*. Here, tradition is married to technology: a modern acoustic laboratory and an archive housing rich recordings enable researchers to study the science of sound.

To further propagate classical music and dance, ITC sponsors the Sangeet Sammelan in Delhi and other Sammelans across the country: festivals that reaffirm ITC's resolve to nurture the nation's arts and culture.

New horizons

I.T.C. Limited

Where else is ITC working for India?

Agro-industry : ITC's technological expertise in seed development is now being transferred to produce oilseeds. The manufacturing and marketing of edible and non-edible oils is helping reduce imports and is aiding thousands of farmers.

Family Health and Welfare : By distributing millions of Nirodh contraceptives, ITC helps educate rural folk about the advantages of a small, well-spaced family.

Cottage-sector Craftsmanship : ITC set up Triveni Handlooms to preserve the traditional craft of Shahjahanpur's weavers. Today 2500 weavers are gainfully employed, their carpets exported by ITC.

New hopes

Contract ITC 20.80

ম্যাক্স ম্যূলারের ভারতপ্রেম : একটি রাজনৈতিক সমীক্ষা

অরবিন্দ পোদ্দার

এক

'যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেন কোন্ আকাশের নীচে মানবমন তার সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত বস্তুর পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করেছে, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার চিন্তায় হয়েছে উদ্বিগ্ন, কোন্-কোন্ সমস্যার সমাধান ও উদ্‌ভাবন করেছে যা আমরা যারা প্ল্যাটো এবং কানট পড়েছি তাদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাহলে আমি বলব ভারতবর্ষ। আর আমি যদি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অন্তর-জীবনকে অধিকতর পরিপূর্ণ, অধিকতর ব্যাপক, অধিকতর বিশ্বজনীন, বস্তুত অধিকতর সুমানবিক করার জন্য—এমন জীবন যা পার্থিব জীবন নয় শুধু, পরন্তু মহিমান্বিত অনন্তজীবন—কোন্ সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারি, তা হলেও পুনরায় আমি বলব ভারতবর্ষ।'

এই মনোহরণ বাক্যগুলি যিনি রচনা করেছিলেন, তিনি হলেন জার্মান পণ্ডিত-গবেষক ম্যাক্স ম্যূলার। এই বাক্যগুলি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যামব্রিজে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশবিশেষ, যার শিরোনাম ছিল, "ইনডিয়া : হোয়াট ইট ক্যান টীচ আস"। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এই নামটিই ছিল শিক্ষিত ভারতবাসীদের নিকট অতিশয় প্রিয় নাম। কারণ, ঋগ্‌বেদ নিয়ে তাঁর গবেষণা এবং অনুবাদের মাধ্যমেই মুখ্যত সেই কালের সাম্রাজ্যমৃগয়ায় ব্যস্ত পাশ্চাত্য দেশগুলি এবং ইওরোপ-আমেরিকার বিদ্বৎসমাজ প্রাচীন ভারতীয় জীবনদর্শন, অধ্যাত্মচিন্তা, দর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হয়। ভারতবর্ষেও দেখা দেয় আশাতীত উৎসাহ এবং প্রতিক্রিয়া। ইংরেজি জানা বা না-জানা অগণিত মানুষ ম্যাক্স ম্যূলার নামটি উচ্চারণে অভিভূত হয়ে ওঠেন—তাঁর গবেষণা আমাদের আত্মপরিচয়ের দিগন্ত উন্মোচিত ও প্রসারিত করে, জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গির প্রস্ফুরণে যোগায় উদ্দীপনা এবং শক্তি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, জাতীয় আত্মবিকাশের বৃহৎ পরিসরে, তাঁর পরোক্ষ অবদান অস্বীকার করা যায় না, উপেক্ষা তো নয়ই।

কিন্তু, এই প্রাপ্তিস্বীকারের পরেও প্রশ্ন থেকে যায়—যা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। কারণ, গোড়ার ওই উদ্‌দ্যুতি থেকে বহমান ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে মমত্ববোধ, আত্মিক সংযোগ, শোষণ ও অত্যাচারবিরোধী মনোভঙ্গি স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা করা যায়, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ বিষয়ে ম্যূলারের বিভিন্ন সময়কার উক্তিতে তা একান্তভাবে অনুপস্থিত। বরং, বিশ্লেষণে দেখা যায়,

তাঁর কণ্ঠস্বর এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কণ্ঠস্বর একই তন্ত্রীতে বাঁধা, পার্থক্য শুধুই স্বরবিক্ষেপের বৈশিষ্ট্যে।

দুই

ম্যাক্স মুলার কখনও ভারতভ্রমণে আসেন নি। সুতরাং, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি যে ভারত সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত, সে ভারত বৈদিক যুগের; ইতিহাসের সীমানা পার হয়ে বলা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের। সে কালের যে বিস্ময়কর মন্ত্রোচ্চারণ, যার ঐশ্বর্য, ছন্দ-মাধুর্য এবং ভাবগত বিস্তারে তিনি বিমোহিত, তাকে তিনি বলেছেন মানবমনের শৈশবের অভিব্যক্তি। মানবমনকে এর ঐতিহাসিক বিবর্তমানতায় জানতে হলে এর শৈশবে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে, নতুবা মানব-অভিব্যক্তিকে সমগ্রভাবে জানা থাকবে অসম্পূর্ণ।

বৈদিক যুগে তাঁর মানসযাত্রা তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষকে ভিত্তি করে শুরু হয় নি; এর উদ্দীপনা তিনি লাভ করেছিলেন জার্মান রোমানটিক আন্দোলনের আন্তর সম্পদ থেকে। জার্মানিতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের দিনগুলোতেই তিনি রোমানটিক ভাবাবর্তে আন্দোলিত হয়েছিলেন, যদিও সেই আন্দোলন তখন অনেকটা স্তিমিত; সেই রোমানটিক মনোভঙ্গিরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ বর্তমান থেকে সরে দাঁড়িয়ে অন্য কোনো সুরলোকে বা পুরাবৃত্তের জগতে স্থিত হয়ে মানসিক মুক্তির আস্বাদন লাভ করা। জার্মান রোমানটিক সচেতনতার নায়কগণ প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের সংস্কৃত চর্চায় সেই আস্বাদন লাভ করেছিলেন। ম্যাক্স মুলার বিশ্বাস করতেন, সমগ্র আর্য বিশ্বের বিবর্তনের ইতিহাসে এক ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। এই ইতিহাসের শৈশব ভারতবর্ষের বৈদিক যুগে, আর যৌবনের পূর্ণতা কানটের দর্শনে [ক্রিটিক অব পিওর রিজন]। আর মানসিকতার শৈশব বেদ সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম বিস্ময় ও আনন্দ, যদিও কোনো-কোনো সময় 'স্থূল এবং শিশুসুলভ' বলে একে ঈষৎ তাচ্ছিল্যও করেছেন।

একদিকে ঋগ্‌বেদ, অন্যদিকে কানটীয় দর্শন—মুলারের জিজ্ঞাসার দুই দিগন্ত। এদের মধ্যে তফাত আকাশপাতাল, তবু তিনি বিশ্বাস করতেন কোনো একটিকে বাদ দিয়ে তাঁর জীবন পূর্ণ নয়। সেজন্য, কানটের পূর্বোক্ত পুঁথির অনুবাদ যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষা জিজ্ঞাসায় অতিবাহিত হয়েছে সারা জীবন। জার্মানিতে যার সূত্রপাত, প্যারিস ছুঁয়ে ইংল্যানডে তার পরিসমাপ্তি। ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির আর্থিক আনুকূল্যে ঋগ্‌বেদের অনুবাদ, ভাষ্য প্রকাশিত হয়, এবং কোম্পানি প্রদত্ত সম্মান-দক্ষিণা তাঁর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য না আনলেও আনে নিশ্চিন্তি; এবং স্বল্পকাল পরেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপনার সুযোগ আসায় তিনি সেখানেই স্থায়ী-ভাবে বসবাস শুরু করেন।

স্মরণীয় যে, ম্যুলার যে কালে তাঁর গবেষণা এবং গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন, তখন ইওরোপের সাম্রাজ্য-বাদী দেশগুলোর, বিশেষত ইংল্যানডের, বিশ্বজোড়া উপনিবেশ স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ। তখন ছিল ওইসব উপনিবেশে রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক আধিপত্যের সূত্রগুলোকে অধিকতর সুদৃঢ় ও সংহত করার প্রশ্ন। অন্যদিকে, খাস ইওরোপে তখন ঘটছিল জাতীয়তা-বাদী মনোভঙ্গির বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ—যার পরিণাম প্রবল শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জার্মান জাতীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাব। ঐতিহাসিক কাল যেহেতু ব্যক্তিমানসকে উদয়াস্ত গড়েপিটে তোলে, সেজন্য জার্মানি ও ইংল্যানড উভয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিবর্তন ও সম্প্রসারণ তাঁর চিন্তামননকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছে; এর প্রমাণ পাওয়া যায় নির্দিষ্ট সংকটের মুহূর্তে জার্মানিকে, অন্য সময়ে ইংল্যানডের পক্ষ সমর্থন করার উদ্যোগে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত জাত্যভিমানের প্রশ্ন।

এই প্রশ্নটি প্রকট হয়ে ওঠে ১৮৭০ সনের ফরাসি-জার্মান যুদ্ধের সময়। এটা খুবই প্রত্যাশিত যে ম্যুলারের জার্মান-সত্তা যুদ্ধ সম্পর্কে জার্মান বক্তব্য এবং বিসমার্কের নেতৃত্বের প্রশংসায় প্রগলভ হয়ে উঠবে, কিন্তু সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক যুক্তি ছাপিয়ে জাতিগত শ্রেষ্ঠতার সন্দেহজনক দাবিকে তিনি যখন প্রাধান্য দান করেন, তখন এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে তাঁর মতো বিশ্ববিশ্রুত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির অন্তরও জাতিবিদ্বেষের ক্লেদে ক্লেদাক্ত। সেভানের যুদ্ধের প্রাক্কালে—যে যুদ্ধে ফ্রান্স চূড়ান্তভাবে পরাজয় বরণ করে—তিনি বন্ধু স্ট্যানলিকে এক পত্রে লেখেন,

'What savages we are in spite of all these centuries! But surely the Teutonic race is better than the Latin and the Slavonic, and the Protestants better Christians than the Romans; and the Germanic cause is surely thoroughly righteous, and the French thoroughly unrighteous.'

অর্থাৎ, এত শতাব্দীর সভ্যতার পরেও আমরা কী বর্বর! তবে, টিউটোনিক জাতিগোষ্ঠী নিশ্চয়ই লাতিন এবং স্লাভদের চেয়ে উন্নত মানের, প্রোটেস্টানটরা রোমান ক্যাথলিকদের চেয়ে ভালো খ্রীষ্টান; আর জার্মানদের নীতি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, এবং ফরাসিদের নীতি সম্পূর্ণ অসঙ্গত। এর মাস দেড়েক বাদে, অকটোবরের প্রথম সপ্তাহে, তিনি গ্ল্যাডস্টোনকে একটি চিঠিতে জানান,

'My great anxiety through all this war has been the unfriendly feeling that is springing up between England and Germany. The whole future of the world seems to me to depend on the friendship of the three Teutonic nations, Germany, England and America.'

গ্ল্যাডস্টোনের নিকট চিঠিতে ইংল্যানড এবং জার্মানির মধ্যে অবন্ধুসুলভ মনোভাবের প্রকাশ দেখে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, এবং বলছেন, তাঁর বিশ্বাস সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ইংল্যানড, জার্মানি এবং আমেরিকা—এই তিনটি টিউটোনিক জাতির বন্ধুতার উপর। এই মনোভঙ্গি অধিকতর দৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত হয় তাঁর মৃত্যুর দু-চার বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধের সময়। তিনি তখন ইংল্যানডের উগ্র সমর্থক, আর তাঁর স্বদেশ জার্মানি পর্যুদস্ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অ-জার্মান রাজ্যগুলোর পক্ষে। বিক্ষুব্ধ মুলার একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন,

'Germans, instead of looking for true blood relations and allies for the future in England and America, have sought for them in France and Russia. They may look for a long time. I hope they will discover, before it is too late, that blood is thicker than ink, and that the Saxons of Germany, England and America are the true, manly and faithful allies in all struggles for freedom in the future as in the past.'

জার্মানরা ইংল্যানড-আমেরিকায় খাঁটি রক্ত-সম্পর্ক এবং সহযোগী না খুঁজে খুঁজছে ফ্রান্স ও রাশিয়ায়। খুঁজুক। তাঁর বিশ্বাস, অচির কালের মধ্যেই তারা বুঝতে পারবে কালি থেকে রক্ত গাঢ়তর, এবং অতীতে যেমন ভবিষ্যতেও তেমনি সমস্ত মুক্তিসংগ্রামে জার্মানি, ইংল্যানড ও আমেরিকার স্যাক্সনরাই খাঁটি, পুরুষোচিত এবং বিশ্বাসী সহযোগী বন্ধু।

আর ভারতীয়দের সম্পর্কে? আই-সি-এস হবার জন্য ভারতীয়দের আগ্রহ তিনি অনুমোদন করতেন না। সরকারি চাকুরিতে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সমতার দাবি যখন সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তখন তিনি তাঁর বন্ধু পার্শি সংস্কারক মালাবারিকে একটি পত্রে লেখেন (৫. ৯. ১৮৮৪),

'With regard to your countrymen, I wonder that they care so much for the Indian Civil

Service. If I were a Hindu, I should look out for very different work to benefit my countrymen. To tell you the truth, I do not believe in the efficiency of a *mixed* Civil Service. Oil and water will not mix—let the oil be at the top, there is plenty of room for the water beneath.'

এর সারমর্ম হল, তিনি মিশ্র সিভিল সার্ভিসের দক্ষতায় আস্থাশীল নন। তেলে-জলে কখনও মিশ খায় না—তেল মাথায়ই থাকুক, নীচে জলের জন্য তো প্রচুর জায়গা রয়েছেই। এই কণ্ঠস্বর চিনতে আমাদের অসুবিধা হয় না, যেমন কিপলিংকে চিনতেও অসুবিধা হয় নি। জাত্যভিমান ও পরজাতি-বিদ্বেষের যুগপৎ অস্তিত্ব বিদ্বজ্জনের মধ্যে খুবই বিরল। ম্যুলারে ছিল।

তিন

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর আর্থিক নির্ভরশীলতার জন্য যতটা না হোক, একটি টিউটোনিক জাতির বিশ্ব-অভিযানের বিস্ময়কর নজির হিসাবে তিনি ইংল্যানডের ভারতবিজয় ও শাসনকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং গর্বে হয়েছেন স্ফীত। মুষ্টিমেয় ক'জন টিউটন প্রতিনিধির এই সফলতা তাঁর মতে তুলনারহিত। স্মৃতিকথায় ব্রিটিশ শাসনের এক উচ্ছ্বসিত বর্ণাঢ্য চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে—

'The Government of India by a mere handful of Englishmen is, indeed, an achievement unparalleled in the whole history of the world. The suppression of the Indian Mutiny shows what stuff English soldiers and statesmen are made of. If people say that ours is not an age for epic poetry, let them read Lord Robert's *Forty-one Years in India*. When I see in a circus a man standing with outstretched legs on two or three horses, and two men standing on his shoulders, and other men on theirs, and a little child at the top of all, while the horses are running full gallop round the arena, I feel what I feel when watching the government of India. One hardly dares to breathe, and one wishes one could persuade one's neighbours also to sit still and hold their breath. If even there were an accident, the crash would be fearful, and who would suffer most? Fortunately, by this time the people of India know all this.'

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার এমন লাগাম-ছাড়া প্রশস্তি সচরাচর চোখে পড়ে না; অবশ্য এই বিবরণের প্রচ্ছন্ন হুমকিটিও লক্ষণীয়। ইংরেজ সৈন্য এবং রাষ্ট্রনায়কগণ কী ধাতুতে তৈরি সিপাহি বিদ্রোহ দমনের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। সার্কাসে ঘোড়ার খেলা যখন দেখা যায়—দুটি বা তিনটি ঘোড়ার উপর ছড়ানো পায়ে দাঁড়ানো একটি মানুষ, তার কাঁধে আর দুজন, তাদের কাঁধে আরও মানুষ, আর সবার উপরে বসা একটি ছোট্ট শিশু, দুরন্ত বেগে ঘোড়াগুলো ছুটছে তো ছুটছে—তখন যেরকম বিস্ময়ের চমক জাগে মনে, ইংরেজের ভারত-শাসন তেমনি অনুভূতি জাগায় ম্যুলারের মনে। হৃদয় স্তব্ধ, শ্বাস বন্ধ, শুধু বিস্ময়ের শিহরন; ইচ্ছে জাগে প্রতিবেশীদেরও ওই শিহরনে স্নাত হতে বলেন। এখানে যদি দুর্ঘটনা ঘটে তো পরিণতি হবে ভয়াবহ, আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারা সবচেয়ে বেশি? আশার কথা, ভারতীয়রা ইতিমধ্যেই তা টের পেয়ে গেছে।

ইংরেজদের শাসনব্যবস্থায় তাঁর নিজস্ব একটি ভূমিকা রয়েছে বলে ম্যুলারের স্থির বিশ্বাস ছিল। তিনি ভাবতে ভালোবাসতেন যে তাঁর গবেষণা, বেদের অনুবাদ ইত্যাদি ভারতবর্ষের এবং লক্ষ-লক্ষ ভারতীয়ের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা নেবে—হয়তো বা তা দেখার জন্য তিনি বেঁচে থাকবেন না। এই মর্মে স্ত্রীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন।

তবে, ইংরেজ-শাসন যে সব দিক থেকেই কল্যাণকর, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ। সেজন্য, ইংল্যানড ইওরোপে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা, ভারতীয় সৈন্য পোষণ ইত্যাদির খরচ যে ভারতবর্ষের উপর চাপিয়ে দিত, এসব তুচ্ছ ব্যাপার তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না। ১৮৯৬ সনে মিশরে ভারতীয় সৈন্য পোষণের খরচপত্র নিয়ে জনমত সোচ্চার হলে ম্যুলার মালাবরিকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'এ নিয়ে চেঁচামেচি করার অত কী আছে? ভারতের আসল সমস্যা শান্তি ও সমৃদ্ধির তুলনায় ওই খরচপত্র তো একটা তুচ্ছ ব্যাপার। যারা ইংল্যানডকে হটিয়ে দিতে চায় সেসব ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের কথা আমি বুঝি, কিন্তু যারা এর তাৎপর্য কী যথার্থ বুঝতে পারে তাদের দাঁড় ধরতে হবে শক্ত হাতে, আর বাইতেও হবে ইংরেজদের মতো দক্ষতায়। তোমাদের অবস্থান একই নৌকায়—এক সঙ্গে ভাসতে পার, আবার এক সঙ্গে ডুবেও যেতে পার।' চিঠিতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে একথাও জানানো হয়েছিল যে সাধারণত তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে।

ভারতবর্ষের পক্ষে এই অর্থে যে, তিনি ইংরেজ শাসনকে ভারতীয়দের পক্ষে সহনীয় করার অনুকূলে ছিলেন, এবং এর উপায় উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টাচরিত্রও করছিলেন নানাভাবে, দীর্ঘদিন ধরে। একটিমাত্র পথই অবশ্য তখন খোলা ছিল—পূর্ণ সাংস্কৃতিক বিজয়ের পথ। তখনও সিপাহি বিদ্রোহের মতো বিস্ফোরক ঘটনা ঘটে নি। তার আগে থেকেই তিনি একটি সুপরিকল্পিত পন্থা অনুসরণ করার কথা ভাবতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে তাঁর বিশেষ শুভানুধ্যায়ী প্রাশিয়ান কনসাল বুনসেনকে একটি পত্রে তিনি জানান, 'সর্বশেষ অঞ্চলগুলো দখল করার পর ভারতের ভৌগোলিক বিজয় সমাপ্ত হল—এর পরে যা আসছে তা হল ধর্মের ক্ষেত্রে ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে সংগ্রাম; অবশ্য এই সংগ্রামের মধ্যেই বিভিন্ন জাতির স্বার্থ কেন্দ্রীভূত।' আর, ডিউক অব আরগিলকে লেখা চিঠিতে খোলাখুলিভাবেই লেখেন, 'India has been conquered once, but India must be conquered again, and that second conquest should be a conquest by education.' অর্থাৎ, ভারতবর্ষকে একবার জয় করা হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষকে আবার জয় করতে হবে; আর এই দ্বিতীয় বিজয় হবে শিক্ষার মাধ্যমে বিজয়। এই বিশ্বাসে তিনি প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন যে, সাংস্কৃতিক বিজয় সম্পন্ন করেই ভারতে ব্রিটিশ শাসন পূর্ণতা অর্জন করবে। কাজটা তেমন কিছু দুরূহও ছিল না।

ইতিমধ্যেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য মূল্যবোধের প্রতি বিপুল আকর্ষণ সেখানে অনুভূত হচ্ছে। তাতে উৎসাহ সঞ্চার করতে হবে সত্য, কিন্তু আসল কাজ হবে ইংল্যানডে। সাম্রাজ্যিক প্রয়োজন যখন প্রবল, তখন তার মীমাংসাও করতে হবে সংহত সাম্রাজ্যিক কর্মোদ্যোগে। সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকে তিনি সংবাদপত্রে চিঠি, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বক্তৃতামালা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শাসকগোষ্ঠীকে একথাটাই বুঝাবার জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেন যে, বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ভারত-প্রবাসী ইংরেজ প্রশাসকদের ভারতীয় ভাষা, সুতরাং ভারতীয় প্রজাদের মনোভঙ্গি সম্পর্কে অজ্ঞানতা। ভারতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কার্যসূচীর সফলতার দরুন সেজন্যই জরুরি প্রয়োজন ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাপনা।' ম্যুলার যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করেন ঐ কার্যক্রম কিভাবে ইংল্যানডের বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সমর্থ হবে; আর তার এই প্রত্যাশাও ছিল, অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য-বিজয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে, অর্থাৎ সেখানে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অচিরেই চালু হবে। সাম্রাজ্যবাদী প্রেক্ষিত থেকে ম্যুলারের যুক্তি অকাট্য। ইংরেজ প্রশাসকগণ যদি শাসিত ভারতীয় প্রজার ভাষার

সাযুজ্য লাভ করে তাহলে তাদের পক্ষে প্রজাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, নৈমিত্তিক প্রয়োজন ইত্যাদি সমস্তারও সাযুজ্য লাভ করা ও সংবেদনশীল হওয়া সম্ভবপর হবে; এবং শাসক-শাসিতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে। অসন্তোষের তীব্রতা বা বিদ্রোহের আশঙ্কা ক্রমেই বিলুপ্ত হবে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্, স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ান প্রমুখ ব্যক্তিগণ। কিন্তু, ম্যুলারের প্রচেষ্টা তাৎক্ষণিক সফলতা অর্জন করে নি। সুদীর্ঘ কাল পর ১৮৯০ সনে প্রাচ্য ভাষা শিক্ষাদানের একটি বিদ্যায়তন লনডনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ করার বিষয়, জ্ঞানানুশীলন এবং গবেষণার জন্য যে নিরাসক্ত নির্জনতা প্রয়োজন, তা বর্জন করে ম্যুলার সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ; প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতি সম্পর্কে তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন। যদিও মালাবরির নিকট লিখিত পত্রে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ভারতের পক্ষে, কিন্তু কার্যত ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে জর্জর ভারতীয় প্রজার দৃষ্টিমার্গ থেকে তিনি ইঙ্গ-ভারত সম্পর্ক বিচার করেন নি। তাঁর প্রেক্ষিত সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ডের প্রেক্ষিত। সেজন্যই, ঔপনিবেশিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো প্রশ্ন নেই, ভারতের সমৃদ্ধি বলতে কার সমৃদ্ধি বোঝায় সে বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা নেই, এখানকার ধনসম্পদে ভারতীয়দের অধিকার কতটুকু এরও কোনো অনুসন্ধান নেই। অবশ্য থাকবার কথাও নয়। কারণ, ইংল্যানডের ভারতবিজয়কে তিনি একটি টিউটোনিক জাতির সফল বিশ্ব-অভিযানের অঙ্গ হিসাবে উপলব্ধি করেছেন। জার্মানি, ইনল্যানড এবং আমেরিকা—এই তিনটি রাষ্ট্র আগামী দিনের পৃথিবীর শান্তি, মুক্তি ও সমৃদ্ধির অধিপতিরূপে বিবর্তিত হবে,—এই ছিল তাঁর উদ্দীপ্ত রাজনৈতিক প্রত্যয়। সুতরাং, ইংল্যানডে প্রাচ্যভাষা শিক্ষাদান ও প্রচারের মধ্যে ওই ভাষার প্রতি সহৃদয় অনুরাগ কতটুকু ছিল বলা কঠিন, কিন্তু সাম্রাজ্য-সংরক্ষণের আকুতি যে ছিল আত্যন্তিক, তা নিশ্চিত।

চার

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অপর একটি মুক্তাঙ্গন হল ধর্ম। এ ক্ষেত্রেও অভিযান চালানোর সংকল্প যে ম্যুলারের ছিল, তাঁর উক্তি থেকে ইতিপূর্বে তা উল্লেখিত হয়েছে। অসংখ্য শাস্ত্রীয়-অশাস্ত্রীয় ধর্মমতের ঘাত-সংঘাতে বিদীর্ণ ভারতবর্ষ যে ধর্মীয় রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত এবং অত্যন্ত উর্বর একটি ক্ষেত্র, সে বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। যে সময়ে তাঁর মনে প্রাচ্যভাষা শিক্ষাদানের প্রশ্নটি দানা বেঁধে ওঠে, ঠিক একই সময়ে ধর্মীয় অভিযানের প্রসঙ্গটিও গুরুত্ব লাভ করে। ১৮৫৬ সনে তিনি বুনসেনকে একটি পত্রে জানান, 'সেণ্টপলের কালে রোম অথবা গ্রীস খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য যতটা প্রস্তুত ছিল, বর্তমান ভারত তার চেয়ে অধিক প্রস্তুত।' তবে তিনি স্বয়ং পাদ্রি সেজে ভারতে যাবেন না, কারণ তাহলে তাঁকে চার্চ-কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করতে হবে; সরকারি প্রশাসক হয়েও যাবেন না, তাতে সরকারের উপর নির্ভর করতে হবে। তিনি ভাষা-চর্চার মতো নীরব সাধনায় মগ্ন থাকবেন, এবং কী উপায়ে ভারতের সর্বনাশা পুরোহিত-তন্ত্র উচ্ছেদ করা যায়, এবং সহজ খ্রীষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটানো যায়, তা নির্ধারণের চেষ্টা করবেন। রঞ্জিত সিং-এর পুত্র মহারাজা দিলীপ সিং-এর সঙ্গে ভারতবর্ষে আসার ইচ্ছা ছিল তাঁর—দিলীপ সিং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ছিলেন এবং ব্রিটিশ রাজদরবারে তাঁর প্রভাবও ছিল বিস্তর, তিনি নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন।

কিন্তু ভারত-পর্যটনের পরিকল্পনা কার্যকর হয় নি। তবে, ধর্মীয় আগ্রাসনের সংকল্পে তিনি ছিলেন অটুট, এবং আজীবন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা তিনি

কিভাবে চালিয়ে গেছেন সংক্ষেপে তার পরিচয় গ্রহণ করা যাক। বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর রোমানটিক ভাবাবেশ সত্ত্বেও পরবর্তী যুগের যে ধর্মচিন্তা, অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় তার বিস্তৃতি ও বিভাজন, কালের সঞ্চয়ে অবধারিত অবক্ষয় ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর অন্তরে ছিল বিপুল অবজ্ঞা। সেই অবজ্ঞার কথা আমরা জানতে পারি ১৮৬৪ সনে লেখা স্ত্রীর নিকট একটি পত্রে। বেদ-গবেষণার উল্লেখ করে তিনি বলেন,

'It is the root of their religion, and to show what the root is, is, I feel sure, the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3,000 years.'

বেদ হল ওদের ধর্মের আদি উৎস; আমি নিশ্চিত, উৎসের স্বরূপ কী তা দেখানোই উৎস থেকে উদ্ভূত তিন হাজার বছরের সমস্ত পুঞ্জীভূত স্তূপকে নির্মূল করার একমাত্র পন্থা। এই পত্রাংশের আপরুট শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত আপত্তিজনক। কারণ, ম্যাক্স ম্যুলারের ভারতপ্রেম প্রবল না হলেও যদি অন্তত আন্তরিক হত, তাহলে তিনি একটি পরাভূত জাতির তিন হাজার বছরের ধর্মজীবন ও উপলব্ধিকে নির্মূল করার আগে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতেন এর কতটা খাঁটি, কতটা আবর্জনা। কিন্তু, সেই মানসিকতার পরিচয় বা ইঙ্গিত না দিয়ে তিনি সব বিলকুল নির্মূল করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এই অভিপ্রায় কি বন্ধুর বা প্রেমিকের বা গবেষকের?

আগেই বলা হয়েছে, ধর্মীয় আগ্রাসনে ম্যুলারের অস্ত্র ছিল খ্রীষ্টধর্ম। ভারতবর্ষে আরও অধিকসংখ্যক মানুষ যাতে ওই মতে ধর্মান্তরিত হয়, সেজন্য তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। নববিধান গোষ্ঠীর ব্রাহ্ম-নেতা কেশবচন্দ্র সেন যখন ইংল্যানডে যান এবং ম্যুলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ও ধর্মীয় তত্ত্ব আলোচনায় মতবিনিময় হয়, তখন তিনি কেশবচন্দ্রকে পীড়াপীড়ি করেন, কালবিলম্ব না করে তাঁর নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম সমাজ যেন নিজেদের প্রকাশ্যে খ্রীষ্টান বলে ঘোষণা করেন। জানি না, অপ্রত্যাশিত এই দাবিতে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত ও জাতীয় আত্মসম্ভ্রমে আঘাত লেগেছিল কিনা, কিন্তু যীশুর দেবত্ব এবং মানব-সত্তা সংক্রান্ত কূট প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়ায়, এবং ইংল্যানডের ধর্মগুরুদের প্রতি স্বাভাবিক বৈরিতার দরুন তিনি ম্যুলারের প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, একটি চিঠিতে জানান তিনি কোনোমতেই প্রাতিষ্ঠানিক খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ হবেন না।

ম্যুলার কিন্তু নাছোড়বান্দা। কেশবচন্দ্রের পর, এবং তাঁর নিজের মৃত্যুর মাত্র বছর-দেড় বছর আগে, তিনি নববিধানের পরবর্তী নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাতে তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের বর্ণাঢ্য ইতিহাস, সে আন্দোলনে যীশুর পরোক্ষ প্রভাব, নববিধান সম্প্রদায়ের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের আদর্শগত সাযুজ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনা করেন, এবং পরিশেষে এক উদাত্ত আবেদনে বলেন,

'From my point of view, India, at least the best part of it, is already converted to Christianity. You want no persuasion to become a follower of Christ. Then make up your mind to act for yourselves. Unite your flock, and put up a few folds to hold them together, and to prevent them from straying. The bridge has been built for you by those who came before you. Step boldly forward, it will not break under you, and you will find many friends to welcome you on the other shore, and among them none more delighted than your old friend and fellow labourer.'

অর্থাৎ, ভারতবর্ষ, অন্তত এর সর্বোত্তম অংশ, ইতিমধ্যেই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছে। কেন যীশুকে অনুসরণ করবেন তা আপনাকে বুঝানো বাহুল্যমাত্র। সুতরাং মন স্থির করুন এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আপনার আগে যাঁরা এসে-

ছিলেন তাঁরাই সেতু নির্মাণ করে গেছেন। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসুন, আপনার নেতৃত্বে তা ভাঙবে না, আর অপর পারে দেখতে পাবেন আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য অসংখ্য বন্ধু সমাগত, আরও দেখবেন আপনার পুরনো বন্ধু ও সহমর্মি এই কর্মী সবচেয়ে বেশি আনন্দিত।

ভারতে তখন জাতীয় মনোভঙ্গির বিস্তার ঘটেছে প্রচুর, এবং ওই বিস্তারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ, তাঁদের ধর্মাচরণের বিশিষ্টতা সত্ত্বেও, অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় আত্মসচেতনতার ওই কল্লোলিত পরিবেশে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পক্ষেও ম্যুলারের এই আহ্বান প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। দীর্ঘকাল তিনি এই চিঠির উত্তর দেন নি। বরং সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করেন নিজের প্রতিবাদী বক্তব্যসহ। পরে তিনি ম্যুলারকে সুস্পষ্ট-ভাবে জানিয়ে দেন যে, নিকট ভবিষ্যতে ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। এরপরেও, মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে ম্যুলার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে আরও একটি চিঠিতে লেখেন, তিনি তাঁদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে চান না, তবে যীশু তো ভারতেরই, যেমন তাঁরাও যীশুরই অনুসারী, ইত্যাদি।

ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ম্যুলারের চেষ্টা আর বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ভারতকে দ্বিতীয়বার জয় করার প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন ডিউক অব আর্গিলকে। এ আশায় তিনি উদ্দীপ্ত ছিলেন সম্ভবত যে, ভারতীয়দের মধ্যে যারা ইংরেজিতে কৃতবিদ্য এবং সোচ্চার, তারা যদি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয় তাহলে ধর্মমতের একতার খাতিরেই তারা তাঁর অন্যতম প্রিয় টিউটন রাষ্ট্র ইংল্যানডের ভারত-সাম্রাজ্যকে চির-স্থায়িত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। এই লক্ষ্যের অনুসরণে পরিচিত সাম্রাজ্য-নির্মাতাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তা-মনন-কর্মের কোনোই পার্থক্য নেই।

আশ্চর্য এই, সমকালীন ভারতবর্ষে ম্যুলারের এই সংগোপন রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে কোনোই সচেতনতা ছিল না। যাঁরা তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছেন, পত্র বিনিময় করেছেন, সমাজ-সংস্কৃতির আলোচনায় প্রাণিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও না। এ প্রশ্নও কখনও উত্থাপিত হয় নি: ভারতীয়দের জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্য, তারা কোন্ ধর্মমতে আশ্রিত থাকবে বা গ্রহণ করবে, অক্সফোর্ডে বসবাস করলেই কি তা নির্দেশ করার অধিকার জন্মায়? ম্যুলার বৈদিক যুগের অধ্যাত্মচিন্তা, দর্শন, সাহিত্যের ঐশ্বর্য পশ্চিমী দুনিয়ার নিকট উদ্‌ঘাটন করেছিলেন; তার জন্য তাঁর প্রতি ভারতের শ্রদ্ধা অপরিসীম। পূর্বোক্ত প্রশ্ন উচ্চারিত না-হওয়ার অন্যতম কারণ এটি। তাছাড়াও সমকালীন ভারতের কোনো-কোনো সমস্যার প্রতি তাঁর সমর্থন ও উদ্বেগ বুদ্ধিজীবীদের নিকট তাঁকে গ্রহণীয় করে রেখেছিল—যেমন, বাল্য-বিবাহপ্রথা রদ, ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় রিপনকে সমর্থন, তিলকের গ্রেপ্তারের পর তাঁর প্রতি সদয় ব্যবহারের আবেদন ইত্যাদি। এসব কারণে ম্যুলারের একটি অত্যুজ্জ্বল ভাবমূর্তি এদেশে সৃষ্টি হয়েছিল। তারও উপরে ছিল লনডনকে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল রূপে গ্রহণ করার প্রবণতা। সেজন্য, এমন সাহসিক ভারতীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব তখন ঘটে নি, যিনি ইওরোপীয় পণ্ডিতদের তাঁদের অধিকারের সীমার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারতেন।

তবু, দ্বারকানাথ ঠাকুরের কিছু সাধুবাদ প্রাপ্য। তরুণ ম্যাক্স ম্যুলারকে তিনি ইওরোপীয় মনোভঙ্গির অনুদার সংকীর্ণতা সম্পর্কে কয়েকটি তীক্ষ্ণ বাক্য শোনাতে পেরেছিলেন। ম্যুলার সে সময়ে লনডনের পথে প্যারিসে অবস্থান করেছিলেন; ঘটনাচক্রে দ্বারকানাথও তখন সেখানে জীবন উপভোগে মত্ত

ছিলেন। পরিচিত হবার পর তিনি ম্যুলারকে তাঁর হোটেলে আমন্ত্রণ জানান; বহু সকাল তাঁরা কাটিয়ে-ছিলেন ভারতীয় সামাজিক রীতিনীতি, ইংরেজি ও বাঙলা ভাষা চর্চায়। দ্বারকানাথ সঙ্গীতরসিক, ইতালীয় সঙ্গীতে দক্ষ,—এ কথা জানায় মুল্যার তাঁকে একটি ভারতীয় গান গাইতে অনুরোধ করেন। প্রথমে তিনি একটি পার্শী গান শোনান, কিন্তু ম্যুলার একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় বা হিন্দু সঙ্গীত পরিবেশন করতে বলেন। দ্বারকানাথ তাই করলেন, কিন্তু ম্যুলার তাতে সুরসঙ্গতি, ছন্দ বা মাধুর্য কিছুই খুঁজে পেলেন না। তখন উত্তেজিত দ্বারকানাথ তাঁকে বললেন,

'তোমরা সকলেই এক রকম। যখনই কোনো কিছু তোমাদের নিকট অভিনব মনে হয়, তাৎক্ষণিক আনন্দ না দেয়, তখনই তোমাদের জাগে বিতৃষ্ণা। আমি যখন ইতালীয় সঙ্গীত শুনি, তখন আমার নিকট তা সঙ্গীত বলেই মনে হয় নি। কিন্তু আমি তা অনুসরণ করতে থাকি, যতক্ষণ না তার পূর্ণ উপলব্ধি ঘটে। অন্য সমস্ত ব্যাপারেও তাই। তোমরা বল আমাদের ধর্ম ধর্ম নয়, কাব্য কাব্য নয়, আমাদের দর্শন দর্শন নয়। ইওরোপের যা মনঃসিদ্ধ সম্পদ আমরা তা উপলব্ধি ও উপভোগ করার চেষ্টা করি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমাদের যা সৃষ্টি তা আমরা ঘৃণা করি। আমরা যেভাবে তোমাদের সঙ্গীত চর্চা করি তোমরা যদি সেভাবে আমাদের সঙ্গীত চর্চা করতে তাহলে দেখতে পেতে তোমাদের সঙ্গীতের মতোই আমাদের সঙ্গীতেও আছে সুরসঙ্গতি, ছন্দ এবং মাধুর্য। যদি তোমরা আমাদের কাব্য, আমাদের ধর্ম, এবং আমাদের দর্শন চর্চা করতে তাহলে দেখতে পেতে অজ্ঞেয়কে তোমরা যতটুকু জান,…আমরাও ততটুকু জানি, সম্ভবত তার চেয়েও গভীরভাবে জানি।' দ্বারকানাথের উত্তেজনা প্রশমিত হলে ম্যুলার স্বীকার করেন, অঙ্কশাস্ত্র ভিত্তি করে ভারতীয়রা যে সঙ্গীত-বিজ্ঞান রচনা করেছে তা তিনি জানেন। পরবর্তী কালে তিনি যখন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তা-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাঁকে এ ধরনের প্রত্যয়শীল প্রতিবাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় নি, এটাই আশ্চর্য।

ভাবতে অবাক লাগে, যখন ম্যুলার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষকে পর্যুদস্ত করার তত্ত্ব প্রচারে ব্যস্ত, এবং পরে তিনটি টিউটোনিক রাষ্ট্রের—জার্মানি, ইল্যানড ও আমেরিকা—ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব-আধিপত্যের চিন্তায় প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন, তখন অন্য একজন লনডন-প্রবাসী জার্মান ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে ঔপনিবেশিক ভারতের তথা বিশ্ব-সমস্যার বিশ্লেষণে তন্ময় ছিলেন। তিনি কার্ল মার্কস। সিপাহিবিদ্রোহ-বিজয়ী ইংরেজ সৈনিক ও রাষ্ট্রনায়কদের শক্তিমত্তার প্রশংসায় ম্যুলার ছিলেন প্রগলভ, আর মার্কস "নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন" পত্রিকায় নিবন্ধের পর নিবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী বীভৎসতার চিত্র উদ্‌ঘাটিত করছিলেন। ওইসব চিত্র কল্পনার তন্তুতে বোনা নয়, অবাস্তবও নয়, সমস্তেরই উৎস ছিল সরকারি প্রতিবেদন। ব্রিটিশ শাসনের পরোক্ষ সুফল সদ্ব্যবহার করে ভারতীয়রা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের শক্ত বনিয়াদ কিভাবে নির্মাণ করতে পারে, মার্কস তাঁর বিশ্লেষণী প্রতিভাকে নিযুক্ত রেখে-ছিলেন তার উপায় নির্ধারণে; আর ম্যুলার ইংল্যানডের সাংস্কৃতিক অভিযানে সহায়তা করে কিভাবে ভারতবর্ষকে চিরদাসত্বের বন্ধনে নিষ্পিষ্ট রাখা যায়, তার চেষ্টায় ছিলেন একাগ্র।

তাঁর চিন্তামননের সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্য তাঁর সমকালীন ভারতীয় বন্ধুরা অনুধাবন করতে পারেন নি। এই প্রবন্ধের শুরুতে যে উদ্‌ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তার চিত্তহারী চমৎকারিত্বে তাঁরা ছিলেন বিমোহিত। কিন্তু, বৈদিক সংস্কৃতের চর্চা ও অনুশীলন ছাড়াও তিনি যে ইংল্যানডের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে অন্য প্রকার ক্রিয়াকলাপেও ব্যাপৃত ছিলেন, সে কাহিনী সম্ভবত জানাও ছিল না। তাঁর ভাবমূর্তি

ছিল অক্ষত। তা ছাড়া, যারা নিজেদের অভিপ্রায়-ঘোষণায় এবং ভারতের কুৎসাপ্রচারে অকপট ও ক্লান্তিহীন—যেমন, জেম্‌স্‌ মিল, মেকলে, কিপলিং প্রমুখ—তাদের চিনতে কোনোই অসুবিধা হয় না। কিন্তু ম্যূলারের ছিল একটি মোহিনী আড়াল—বৈদিক ঐশ্বর্য ও আপাত বন্ধুতার বর্ণে রঞ্জিত। সেই আড়াল যেমন ছিল অনাবিষ্কৃত, তেমনি তা ভেদ করার প্রশ্নও অবান্তর। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বকে অবিশ্বাস করা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী। অথচ বর্তমান আলোচনায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, জাতীয় আত্মবিকাশ ও জাতীয় সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাক্স ম্যূলারের মতো প্রজ্ঞাবান ভারতপ্রেমিকরাই ছিলেন অধিকতর বিপজ্জনক।*

*ম্যাক্সমুলার সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য নীরদচন্দ্র চৌধুরীর "স্কলার এক্সট্রাঅরডিনারি" গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

অরবিন্দ পোদ্দারের জন্ম ৩রা নভেমবর, ১৯২০, শ্রীহট্ট জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশে)। বলতে গেলে শৈশব থেকেই তিনি রাজনৈতিক ও প্রগতিবাদী সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। শ্রীপোদ্দার বর্তমানে অধ্যাপনা-পেশা থেকে অবসর নিয়েছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষক ও সমালোচক হিসাবেই তাঁর পরিচয় সর্বাধিক। বঙ্কিম-মূল্যায়নের প্রশ্নে সাহিত্যসমালোচনায় তিনি এনেছেন নতুন ধারা। ড. পোদ্দার বঙ্গীয় রেনেসাঁসের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের অন্যতম পথিকৃৎ। এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল, "বঙ্কিম মানস", "রবীন্দ্র মানস", "রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব", "রামমোহন/উত্তরপক্ষ", "মানবধর্ম ও বাঙলা কাব্যে মধ্যযুগ", "বঙ্কিম ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যের শত্রুরা", *"Renaissance in Bengal—Quests and Confrontations"*, *"Renaissance in Bengal—Search for Identity"* ইত্যাদি।

সময়ের অদৃশ্য আড়ালে

বিরাম মুখোপাধ্যায়

দোলনচাঁপার বৃন্তে মরা-ঝরা রোদ—টলমল
ছায়া ঝাঁপাবে কি ইন্দ্রদ্বাদশীর সাঁ-সাঁ
ভরা-কোটালের আদিগন্ত দৈত্যস্রোত
বাঁধভাঙা মাতাল বন্যায়?

বনেদির ছ'মহল প্রাসাদের পঙ্খের দেয়ালে
এক-চিড় কালো চুল এলায়িত চিকন রেখায়
অপ্রচ্ছন্ন ধ্বংসের ইশারা—
ফাটলের ঠোঁটে ও চিবুকে
আচুম্বিত অতিহিম রক্তিম গোধূলি।

আরোগ্যসম্ভব
ইষ্টনাম বকলমে স্বস্ত্যয়ন সকাল-বিকেল
কাপালিক-নির্মম সময়
প্রতিযোগী আণবিক পরমাস্ত্রে ভরন্ত ভাঁড়ার
লণ্ডভণ্ড পিণ্ড আঁধার
শকুনের কালোডানা-ঢাকা
থিকথিক শবের পাহাড়
চৌমাত্রিক আবিলতা শিহর-বিস্ময়
জীবন কি চায়!

কানে বাজে ফিনিক্সের গান
টানটান মানবিক মৈত্রীর অন্বয়ে
অন্তরঙ্গ আপামর অভিন্নহৃদয়ে
আমি বাঁচি; প্রপীড়িত পৃথিবী বাঁচুক
সুস্থ ঋজু আনন্দিত সম্ভোগে সংযমে
নিয়মের ছক-ছন্দ মড়কের চণ্ডনীতি ভেঙে
উঁকি দ্যায় জ্যোতির্ময় সমৃদ্ধ সকাল
অবিচ্ছিন্ন সময়ের অদৃশ্য আড়ালে॥

হাজার মুক্তোর স্বপ্ন

সৈয়দ নূর হোসেন

ছোট্টবেলার বরিশাল
কৈশোরের বাড়ন্ত সময়
নাজির মহল্লা কিংবা ঝাউতলায়
কেটেছে ধর্মের উদারতায়।
একবার গায়ে যখন
বাউনহাটি হল
মা পাঠালেন
লাখুটিয়ার মামিমার বাড়ি
মধ্যাহ্নভোজে
ব্রাহ্মণের মন্ত্রপড়া ভাত
রুইমাছের ঝোল।
আমার লজ্জা ছিল
কিন্তু দ্বিধা ছিল না
আর মিসেস দিলীপ রায়চৌধুরী
মায়ের মতোই আদর করে
খাওয়ালেন পাশে বসে।

ঈদের আনন্দ আর দুর্গোপুজোয়
কোনো প্রভেদ দেখি নি
পোলাও কোরমা কিংবা কোফতা-কাবারের
আসক্তি আমায় বঞ্চিত করে নি
পায়েস আর পুজোর প্রসাদ থেকে।

ঈদের জামাত ভোরবেলায় আযানের
ভৈরবী সুর আকাশে ফানুস
পুজোর ঘণ্টা ধূপের ধোঁয়া
সারা রাত কীর্তনের তন্ময়তায়
আত্মবিস্মৃতি
মহররমের তাজিয়া মিছিল
ভক্তদের স্বদেহপীড়ন—
আমি স্পষ্ট দেখতে পাই
পঞ্চাশের দশকে আমার
বরিশালের শৈশবের দিন।
মনে পড়ে

সেলিনা আপা মিনতির স্মৃতি পুষ্পদির রূপ
বাসুদার বাঁশি
আলতাফ মাহমুদের গান
মালেক খানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী
আবৃত্তির কণ্ঠ
স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন খোকন ভাই
প্রিন্সিপ্যাল ম্যাকিনানির
জ্ঞানের হৃদয়।

বাড়ির পাশেই মাঠ
সেখানে আখড়ায় কুস্তি করেছি
রণজিতের সাথে
নেচেছি ব্রতচারী নাচ
সেলিম ভাইয়ের মুকুল ফৌজে।

ব্যাটবলের শব্দ হলে
ঘর থেকে দিতাম ভোঁ দৌড়
টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলেছি
আশ্চর্য হয়ে দেখতাম
কল্যাণদার একহাতে ক্যাচ।
বরিশালে ক্রিকেটের হিরো তখন
মজিদ ভাই আর পঙ্কজদা—
বেশ মনে আছে
পঙ্কজদা আমাকে উৎসাহিত
করার জন্যে উপহার দিয়েছিলেন
দুটো বই
খেলার রাজা ক্রিকেট আর
মজার খেলা ক্রিকেট।

বাড়ির কাছে সোনালি হলের
চাকচিক্য ছিল অনেক
ওদের ঘোড়ার গাড়ির পেছনে-পেছনে
দৌড়তাম সিনেমার বিজ্ঞাপনের
রঙিন কাগজ কুড়োতে

তখন জগদীশ হলের সাথে
সোনালির ছিল দুর্দান্ত প্রতিযোগিতা।
মাঝে-মাঝে সোনালি হলের
সামনে দাঁড়িয়ে দেখতাম
শিল্পী শান্তিদার অদ্ভুত
তুলির স্পর্শে চিত্রপটে প্রাণবন্ত
নায়ক-নায়িকারা।
ওই সোনালি হলেই দেখেছি
জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয়
ছবি 'শাপমোচন'
উত্তম-সুচিত্রার অভিনয়।
হেমন্তের
সে কী প্রাণস্পর্শী গান—
'ঝড় উঠেছে' কিংবা 'শোনো বন্ধু শোনো'।

স্কুল থেকে ফিরে
রাজ্জাক আর আবেদিনের সাথে
হাঁটতাম বেলস পার্কের রাস্তা ধরে
লাল সুরকির রাস্তা
একদিকে ঝাউগাছ
অন্যদিকে পামের সারি
অদূরে কীর্তনখোলা নদী—
আমার কৈশোরিক কাব্যচেতনায়
নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বিচিত্র লীলাভূমি।

কীর্তনখোলাকে আরো ভালো লাগত
যখন আকাশে উঠত
বর্ষার ঘন কালো মেঘ
পামের সারিতে লাগত কাঁপন
আর নদীর বুকে ছোটো নৌকোগুলো
হত দোদুল্যমান।

আর—
বর্ষার দিনেই ঢিল ছুঁড়েছি

কামুদার সেই আমড়াগাছে
কিংবা জামরুলের থোকায়
বিমোহিত চিত্তে তাকিয়ে দেখেছি
কদমফুলের কোমল রূপ।

বর্ষার বাতাসে
তন্বী সুপুরিগাছের নাচন
বাড়ির পেছনে,
কচুপাতার টলমলে পানি
উঠোনের কোণে—
হাজার মুক্তোর স্বপ্ন
আমার ছোট্টবেলার বরিশাল।

কোমল ধৈবত

শান্তিকুমার ঘোষ

কে বীণাবাদিনী
ধৈবতে ধরেছ তান
বনের রহস্য ফুঁড়ে
হ্রদের কিনার ছেড়ে
স্বপ্নের হরিণগুলি
আসে ঊর্ধ্বশ্বাসে
কেন্দ্রে কোন্ বেদনার
শব্দময়ী বিরহিণী
তোলে নৈঃশব্দ্যে ঝংকার
ভোর না হতেই সকাল
হরিদ্রার রাগিণী
অতৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ে
বসন্তের মর্ম ছিঁড়ে
পূর্ণতা কি প্রাপণীয়
দীর্ঘশ্বাস জীবন জুড়ে

সেদিন বিকেলে

বিপ্লব মাজী

সেদিন বিকেলে
তোমাকে বিদায় জানিয়ে ফেরার মুহূর্ত থেকে জেনেছি :
হারাচ্ছি
কিছু একটা হারাচ্ছি
অসংখ্য অনুভূতি
স্মৃতি

কোনো চিহ্ন নেই
না স্মৃতিতে
না চোখের জলে
তোমার

কত নিঃশব্দে
যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল
সূর্যাস্তের পালকে-পালকে

স্তব্ধ ব্যথা
মিশে গেল পাথরে-পাথরে
ঘাসের সবুজে

এরকম মুহূর্তেও
বাইরে তাকিয়ে দেখি :
কত বড়ো আকাশ
কত বড়ো পৃথিবী
সূর্য কী মসৃণ আর ধারালো
ট্রাফিকের স্রোতে
কোথাও থেমে নেই
জীবনস্পন্দন

আমি কত কী বলতে পারতাম
কত কী ব্যথার আশার
সব কত দ্রুত
কে যেন রবারে মুছে নিল

আমার স্বপ্নপুঞ্জ
পরিশ্রুত ছায়া
এলোমেলো করে ঢেকে নিল
এমনকী তোমার মুখের
একটিও রেখা আর
মনে নেই…

ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির

[তৃতীয় কিস্তি]

সুধীর চক্রবর্তী

সন্ধাভাষার মতো লালন ফকিরের সবকিছু নিয়ে পণ্ডিতদের এত আলো-আঁধারি, তাঁর কাব্যসত্য বা জীবনপ্রত্যয়কে একপাশে সরিয়ে রেখে তাঁর জন্মস্থান আর জাতিবর্ণ নিয়ে তর্ক ও বিতর্ক কেন এত প্রাধান্য পেয়ে গেল? লালনের সাধনপীঠ কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া আশ্রম যদি খণ্ডিত বাঙলার পাকিস্তান অংশে না পড়ত, তবে আধুনিক সময়ের মানুষজন দুই বাঙলায় এত মাতামাতি করতেন কিনা সন্দেহ। পাকিস্তানের পত্তনের পরে-পরে, পূর্ববঙ্গের একদল মানুষ নজরুলকে নিয়ে হাস্যকর রকম বাড়াবাড়ি করেছিলেন। তাঁর রচনার কোথাও-কোথাও শব্দবদল ঘটানো হয়েছিল সচেতন পরিকল্পনায়—যেমন, 'নবনবীনের গাহিয়া গান / সজীব করিব মহাশ্মশান' পংক্তির 'মহাশ্মশান' শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছিল 'গোরস্তান'-এ। একই প্রবণতা থেকে লালনের মুসলিম উৎস নির্ণয় এবং তাঁকে সুফি সাধকরূপে প্রচার বিষয়ে একদল পূর্ব-বঙ্গীয় পণ্ডিতদের বাড়াবাড়ি দেখবার মতো। অথচ তাঁর সমসাময়িক পাগলা কানাই, পাঞ্জু শাহ বা গোঁসাই গোপালের মতো ভাবসাধক বা গীতিকার সম্পর্কে বৃহত্তর কোনো উদ্যম দেখা যায় না। কাঙাল হরিনাথ (ফিকিরচাঁদ) যে অপরূপ গানগুলি রচনা করেছিলেন তার সহজপ্রাপ্য সংকলনই বা কই? অথচ তাঁরা সবাই কুষ্টিয়া বা যশোহরের ভূমিপুত্র, কিন্তু তাঁদের হিন্দু বা মুসলিম উৎস তর্কাতীত, তাই তথাকথিত পণ্ডিতদের উৎসাহ কম। ফলে তাঁদের সম্পর্কে মেরেকেটে যদি বা একখানা বই লেখা হয়, তবে লালন সম্পর্কে লেখা হয় অন্তত ত্রিশখানা বই। লালনগীতির নানা বর্গের সংকলন বেরোয় আঠারোটা। তাঁর গানের ভাষান্তর ঘটে, পড়ে অবলেপ। দুই বাঙলার আর কোনো লৌকিক গীতিকার সম্পর্কে আমরা এর এক-দশমাংশ উৎসাহ দেখাই নি।

লালনের গানের মর্ম যদি আমরা যথার্থ অনুধাবন

করতাম তবে তাঁর জাতিধর্ম সম্পর্কে নিরুৎসুক থাকাই হত সবচেয়ে শোভন ও সংগত। তাঁর জীবনের অনুপুঙ্খ বা বানিয়ে-তোলা মিথ তাঁর গানকে বুঝতে কতটুকু সাহায্য করবে? বোঝা দরকার যে, লালনের জীবন-পর্ব আঠারো শতকের শেষ অংশ ছুঁয়ে উনিশ শতকের শেষ দশকের আগে শেষ হয়েছে। তিনি ছিলেন নিম্নবর্গের গ্রাম্য-জীবনের গুহ্যসাধনের ভাবুক। সে-সাধনায় জীবনপরম্পরার জটিলতা বা নাটকীয়তা খুব জরুরি নয়। কেননা লোকায়ত গুহ্যসাধনা অনেকটাই দেহগ্রাহ্য আচরণঘটিত এবং তার বিশেষ অনুভব থেকেই জেগে ওঠে গান। এসব ক্ষেত্রে তাই জীবনের বাহ্য ঘটনার চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে ব্যক্তির একান্ত সাধনার অতলতা। কিন্তু লালন সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল বা অনুসন্ধান সম্পূর্ণ উলটো পথে চলেছে। মধ্যযুগের ভারতীয় সন্তসাধকদের সম্পর্কে আমরা এমন উলটো পথে চলি নি। কবীর, নানক, সুরদাস, দাদূ, রজ্জব, একনাথদের সম্পর্কে জাতিবর্ণের প্রশ্ন বড়ো হয়ে ওঠে নি। এমনকি তাঁদের পদবীটাও আমরা জানি না। তাতে কোনো অসুবিধা হয় নি। তাহলে লালনকে নিয়ে আমাদের এত দুশ্চিন্তা কেন?

মনে হয়, আধুনিক সাহিত্য বুঝতে যে বিচারদৃষ্টি বা পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে, লালনের মতো ভাব-সাধকের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা ঠিক হয় নি। বস্তুত, আধুনিক সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে লেখকের জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য জানা দরকার। কেননা এ লেখকের জীবনঘটনার সানুপুঙ্খ তথ্য তাঁর শিল্পকে বুঝতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, তাঁর জীবন-ঘটনাকে কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে বুঝে নিলে লেখক-হয়ে-ওঠার প্রত্যেকটি স্তর ও উত্তরণের পর্যায়-গুলি বুঝতে সুবিধা হয়। আধুনিক কবি বা লেখকের ব্যক্তিচৈতন্যের এইসব স্তর বা উত্তরণের পর্যায় থেকে তাঁর মানসবিবর্তনের চিহ্নগুলি শনাক্ত করা যায়। সেটা জরুরি, কেননা আধুনিক সাহিত্য আসলে একজন আধুনিক মানুষের সমাজসচেতন অবস্থানের ক্রমিক চিহ্ন। সেই অবস্থান নানা পতনে-উত্থানে সমাকীর্ণ, প্রত্যয়ে ও স্ববিরোধে সংকুল, প্রেম ও প্রেম-হীনতায় উদ্বেল। সূক্ষ্ম বিচারে বোঝা যায়, আসলে আধুনিক একজন কবি বা লেখক তো কেবল ব্যক্তি নন, তিনি প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ সমাজের শ্রেণী-প্রতিনিধি, যে-শ্রেণীকে নিয়েই তাঁর অস্তিত্বের সূচনা। হয়তো সেই বিশেষ শ্রেণীকেই তিনি ভাঙতে চান অথবা নিজের শ্রেণীকে মেশাতে চান অন্যতর শ্রেণী-পংক্তির সঙ্গে। আধুনিক শিল্পীর আরেক সংকট হল ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বকে মেলানো। নানা বৈজ্ঞানিক কুৎকৌশলের অভাবিত সমারোহ আর বৈদ্যুতিন জগতের রূপরেখা নিয়ে আধুনিক ব্যক্তিমানসের সামনে এখন বিশ্ব এতটাই ঘনিয়ে এসেছে যে তাকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা চলে না। আধুনিক জীবনের সবচেয়ে বড়ো দায় তাই সর্বাধুনিককে জানা-চেনা। তাকে যথার্থভাবে বুঝে নেবার আততি বা বুঝতে না পারার শূন্যতা। সত্যিকারের আধুনিক লেখক এখন অভূতপূর্ব এক সংশয়ে আপ্লুত। ব্যক্তিগত শিল্পধারণার চরমোৎকর্ষ সত্ত্বেও তিনি হয়তো সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠেন না। তাঁকে হতে হয় অনেকান্ত ও বৈশ্বিক।

এখানেই অবশ্য শেষ নয়। এরপরেও থাকে সমস্যা। কেননা কবি বা সাহিত্যিকের কাজ তো শুধু সমকালের গ্রহণীয়তা বা জনপ্রিয়তা নয়, সেই সমস্যা হল সিদ্ধির সমস্যা। এ হল আরেক ধরনের আত্ম-সংকট, যার থেকে ত্রাণের পথ তাঁকেই বার করতে হয়। যাকে বলে, নিজের লেখাটি নিজের মতো করে বার করে আনা। সেটাই সিদ্ধি। সেটা নিজেরই স্বারোপিত দায়। তাতে বাধা অনেক। সবচেয়ে বড়ো বাধা জনপ্রিয়তা কিংবা প্রতিষ্ঠানের অলক্ষ নির্দেশ। এ দুটি বাধা অতিক্রম করতে না পারলে কবি বা সাহিত্যিক মুক্তি পাবেন না। একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা জীবনানন্দ সম্পর্কে আধুনিক পাঠক বা সমালোচক তাই এত জানতে উৎসুক যে, কীভাবে তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন সংকটের পর্যায়গুলি। ব্যক্তি ও বিশ্ব কেমন করে তাঁদের সৃজনমানসে পরযুষিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে তাঁদের তত্ত্ব ও বিশ্বাসের রূপায়ণ কতখানি এসেছে তাঁদের রচনায়। মানুষটি কেমন ছিলেন? জীবন, সমাজ, রাষ্ট্রকাঠামো, সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণীবিচ্ছিন্নতার সঙ্গে কেমন করে তাঁরা সংগতি স্থাপন করতে পেরেছিলেন বা পারেন নি।

তুলনামূলকভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যবিচার অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথমত সে যুগে গদ্য ছিল না, লিরিকও প্রকৃত অর্থে ছিল না। ফলে, সাহিত্যে আঙ্গিকবৈচিত্র্য ছিল কম এবং কাব্য ছিল ব্যক্তি-মুখী নয়, বিষয়মুখী। বাঁধা পয়ার ও ত্রিপদীতে কাব্যভাবনা বিচরণ করত বলে ছন্দ-ভাঙা কিংবা নবছন্দের নিরীক্ষা করার ব্যক্তিক প্রয়াস ছিল নিতান্ত বিরল ঘটনা। সবচেয়ে বড়ো কথা, মধ্য-যুগের বাঙলা সাহিত্যে লেখকের তেমন কোনো সামাজিক বা ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা ছিল না। রাজসভা কিংবা উচ্চবর্গের আদেশে বা ইচ্ছায় তখন কাব্যসাহিত্যের পত্তন ঘটেছে, কিংবা কখনও বা ধর্মীয় অনুজ্ঞায়। সমাজের চাহিদা বা ব্যক্তিক অস্থিরতায় শিল্পীর আত্মপ্রকাশ মধ্যযুগে কমই ঘটে। সেই জন্য মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—তখন কবি বা গীতিকার শ্রোতাদের দিতেন একটি নিটোল কাহিনী, এক প্রগাঢ় নীতিবোধ, একটি দুটি চরিত্র, কয়েকটি চমৎকার অলংকৃতি—কিন্তু নিজেকে দেওয়ার কোনো দায় ছিল না তাঁর। সেই কারণে দশম থেকে অষ্টাদশ শতক এই আটশো বছরের বাঙলা সাহিত্যের বিপুল ফসলের মধ্যে আবিষ্কার করি মাত্রই কজন ব্যক্তিপ্রতিভাকে, যাঁরা নিজেদেরও কোনো না কোনোভাবে দিয়ে-ছিলেন। যেমন—জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, আলাওল, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র। হিসেব করলে দেখা যাবে এঁরা জনপ্রিয় কাহিনী বা কাব্যের বিন্যাসটা ভাঙতে চেয়েছিলেন, দেবচরিত্রের মধ্যে এনেছিলেন মানবীয় সারাগ, সমসাময়িক সমাজবাস্তবতা চুঁইয়ে পড়েছিল একটু-আধটু, প্রথাগত বর্ণনার ফাঁকে এসেছিল স্বতন্ত্র অবলোকনের ঝলক, ধূসর নানা গতানুগতিক চরিত্র-সৃষ্টির মিছিলে এসে গিয়েছিল এক-আধজনের বর্ণময় তির্যক উপস্থিতি। এ ছাড়া যেটা লক্ষণীয় তা হল এঁদের রচনাকুশলতা বা শৈলীগত স্বাতন্ত্র্য এবং বিষয়-মুখী রচনার বস্তুপটে রুচিৎ কখনও শনাক্ত করা গেছে এঁদের স্বকীয়তার মুখশ্রী। মধ্যযুগের চলমান বাউল-মারফতি-মুর্শিদাগানের ধারায় লালন ফকিরও এমনই এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিভাবনা জুড়ে দিয়েছিলেন—একথা বললে তাঁর আধুনিকতার ধরনটা স্পষ্ট হয়ে

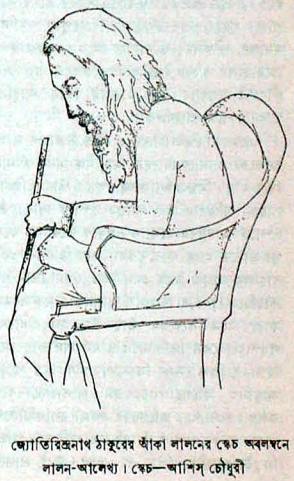

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালনের স্কেচ অবলম্বনে লালন-আলেখ্য। স্কেচ—আশিস্ চৌধুরী

ওঠে। ভারতচন্দ্রের মধ্যে কেউ-কেউ দেখেছিলেন শেষ মধ্যযুগের প্রথাবদ্ধতা মেনেও একপ্রকার স্বয়ম্বশ আধুনিক মনের ঔজ্জ্বল্য, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় কেউ-কেউ পেয়েছেন প্রাচীন-আধুনিকের মোহানা। তেমনই আঠারো শতকে এক-পা আর উনিশ শতকে এক-পা-রাখা লালন ফকিরের গানে একটা অন্তঃশীল বিমিশ্রণ ধর্ম আছে, যা বাউলগানের বন্দিশ মেনে নিয়েও ব্যক্তি-উচ্চারণে বিশিষ্ট। তিনি ধর্মগ্রহণে শুধু প্রতিবাদী নন, বক্তব্যেও প্রতিবাদী। তাঁর জীবন-ঘটনায় অন্তর্‌গূঢ় আড়াল থাকলেও গানের অন্তঃপুর খুব স্পষ্ট বিশ্বাসের স্পন্দনে মুখরিত; উচ্চবর্গের জন্য তিনি কিছু লেখেন নি। তিনি চেয়েছিলেন অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসহায় নিম্নবর্গের মানুষের দিশারি হতে। নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন তাদের ধর্মের নামে শাস্ত্র, পুরাণ, ব্রত-উপবাস, বিগ্রহপূজা, মন্দির-মসজিদ, তীর্থভ্রমণ ও নামাজ থেকে। প্রবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন তাদের ইহজীবনের বাস্তবতায় এবং দেহ-জীবনের বস্তুবাদে। সে কারণেই তিনি আধুনিক ভাবনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক।

একেকটা ক্ষিপ্র বাচনে ও দীপ্র উচ্চারণে লালন ফকিরের গান আমাদের আধুনিক মননকে নাড়া দিয়ে যায়। নিষ্ফল জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রতিবাদ, সচেতন যুক্তিবাদ এবং মানুষ সম্পর্কে আস্থা তাঁর সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমকে উদ্বোধিত করে। খুব জানতে ইচ্ছে করে, কেমন করে উনিশ-শতকীয় বাঙলার প্রত্যন্ত গ্রামে এমন উন্নত চেতনা তিনি লাভ করেছিলেন? কারা ছিলেন তাঁর সমকালীন ও সহমর্মী, কারা বহন করেছেন তাঁর উচ্চ ভাবনাধারণার পরম্পরা? কেন তিনি ফকিরি ধর্ম অঙ্গীকার করে-ছিলেন? কিন্তু সেসব জিজ্ঞাসা গৌণ হয়ে পড়েছে আধুনিক কালের কয়েকজন লালন-গবেষকদের কাছে। দুশো বছর আগেকার একজন লোকগীতিকার লালন ফকির সম্পর্কে তাঁদের বিচারদৃষ্টি হয়ে পড়েছে কিছুটা প্রান্তীয়, কিছু বা ভ্রান্ত। তাই লালনের জন্মস্থান আর জাতি নিয়ে বিবাদ আজও মিটল না। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের অগ্রগণ্য লেখক ড. সুকুমার সেন তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" বইতে লালন সম্পর্কে লিখেছেন :[১]

> উনবিংশ শতাব্দীর বাউল-কবিদের মধ্যে লালন ফকিরের স্থান খুব উচ্চে। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। লালন থাকিতেন কালি-গঙ্গার ধারে, ঠাকুরদের জমিদারি বিরাহিমপুর পরগনায় ছেউড়িয়া গ্রামে। শোনা যায় ইনি কায়স্থের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুইই ছিল। ১২৯৮ সালের ১লা কার্তিক ১১৬ বৎসর (?) বয়সে লালনের দেহত্যাগ হয়।

"বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" নামের বহুমান্য বইটির লেখক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লালন সম্পর্কে কিছু নিজস্ব বিশ্লেষণ করেছেন।[২] তাঁর মতে

> রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের বাউল গান অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাঁহার জন্যই লালনের গান সম্বন্ধে আধুনিক কালের শিক্ষিত সমাজ কৌতূহলী হইয়া উঠেন।...খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ লালনকে চোখে দেখেন নাই, কারণ জমিদারী কর্মোপলক্ষে তাঁহার শিলাইদহে যাইবার পূর্বেই লালনের তিরোধান হয়।...তাঁহার পদে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত যে সমস্ত ইঙ্গিত ও উল্লেখ আছে, তাহাতে তাঁহাকে একজন মনীষী পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়।...লালন নাম তাঁহার প্রকৃত কৌলিক নাম, অথবা বাউল ফকিরী দীক্ষা লাভের পর তিনি এই নামে পরিচিত হন, তাহা জানা যাইতেছে না। লালন বাহ্যতঃ মুসলমান ফকিরবৎ আচরণ করিলেও খুব সম্ভব আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, করিলে হিন্দু সমাজে তিনি এতটা শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিতেন না।

দুইজন প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকারের মন্তব্য অনুধাবন

করলে মানতে হবে যে লালন জন্মসূত্রে ছিলেন হিন্দু। ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন কি হন নি তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত লালনের সম্পর্কে জনশ্রুতি-জাত জীবনবৃত্তান্ত যাঁরা সমর্থন করে গেছেন তাঁদের তালিকা দীর্ঘ। তাঁরা হলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বসন্তকুমার পাল, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কাজী মোতাহার হোসেন, মুহমদ মনসুর-উদ্দীন, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, আহমদ শরীফ, বিনয় ঘোষ, আনিসুজ্জামান প্রমুখ।

লালনের জন্মস্থান নিয়ে একেক গবেষকের একেক মত আমাদের রীতিমত বিভ্রান্ত করে দেয়। এখানে সেই মতান্তরের তালিকা পেশ করে বিষয়টির স্ববিরোধ দেখানো যায়। লালনের জন্মস্থান—

১. আবদুল ওয়ালীর মতে যশোহরের ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রাম।
২. বসন্তকুমার পালের মতে কুষ্টিয়ার কুমারখালির অন্তর্গত ভাঁড়ারা গ্রাম।
৩. কাঙাল হরিনাথের মতে কুষ্টিয়ার অন্তর্গত ঘোড়াই গ্রাম।
৪. এ. কে. এস. নূরের মতে যশোহর জেলার ফুলবাড়ি গ্রাম।

জন্মস্থানঘটিত এই বিভ্রান্তির পাশাপাশি একাধিক লালন সংক্রান্ত একটা গোলযোগ আছে—এ তথ্য-টুকুও খুব অস্বস্তিকর। হরিশপুরে নাকি আরেক লালন থাকতেন। এ কথা জানা যাচ্ছে আবুল আহসান চৌধুরীকে লেখা বসন্তকুমার পালের এক চিঠি থেকে। তিনি লিখেছেন :[৩]

> হরিশপুরে লালন ফকির নামে যিনি প্রকট হইতেছেন তিনি আমার লিখিত পুস্তকের মহাত্মা লালন ফকির নহেন। যাহাতে দুই লালন একত্র মিশিয়া না যায় এজন্য (তারাপদ) শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে সাবধান করিয়া দেন।

আরেক লালনের অস্তিত্ব বিষয়ে সমর্থন মেলে সতীশ-চন্দ্র মিত্রের "যশোহর ও খুলনার ইতিহাস" বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে (প্রথম সংস্করণ ১৯২২)। সেখানে বলা হয়েছে :

> যে সব লোকে এই মতের [অর্থাৎ গুরুসত্য গীত] গান রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে যশোহরের লালন ফকির ও ঈশান ফকির প্রধান।

আগে উল্লেখ করেছি যে ১৯০০ সালে প্রকাশিত এক ইংরাজি নিবন্ধে আবদুল ওয়ালী সর্বপ্রথম লালন ও তাঁর গুরু সিরাজ সাঁইকে হরিশপুর-নিবাসী বলে নির্দেশ করেন। বসন্তকুমার পাল, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন তাঁদের আদি পর্বের লালন-চর্চার কালে ওয়ালী সাহেবের নিবন্ধটির হদিশ জানতেন না। অবশেষে মুহম্মদ আবু তালিব, এস. এম. লুৎফর রহমান ও খোন্দকার রিয়াজুল হক—পূর্ব-পাকিস্তানের এই তিনজন গবেষক বিচ্ছিন্নভাবে বলতে থাকেন যে লালনের জন্ম হরিশপুরের সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে। তাঁরা ওয়ালীর নিবন্ধের তথ্যকে প্রামাণিক বলে উদ্ধৃত করেন যেহেতু তিনি বলে-ছিলেন লালন ও সিরাজ সাঁই হরিশপুরের অধিবাসী। কিন্তু ওয়ালী আরও যে দুটি কথা বলেছিলেন, যথা লালন was known as a Kayastha এবং made pilgrimages to Jagannath and other shrines, সে প্রসঙ্গ দুটি চেপে যান। লালন জন্মসূত্রে মুসলমান হলে জগন্নাথদর্শন করেন কীভাবে?

লালনকে জন্মগতভাবে মুসলমান যাঁরা বলতে চান তাঁদের অগ্রচারী অধ্যাপক আবুতালিব তাঁর "লালন-চরিতের উপাদান : তথ্য ও সত্য" প্রবন্ধে ওয়ালীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন খণ্ডিতভাবে। তাতে এইটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে লালন ও সিরাজ সাঁই যশোরের হরিশপুরের মানুষ। জন্মগতভাবে মুসলমান প্রমাণিত হয় নি, কেননা সেকথা তো ওয়ালী লেখেন নি। আবু তালিব তাঁর "লালন পরিচিতি" (১৯৬৮) বইতে আরেক কাণ্ড করেছেন। বইয়ের ৫ পৃষ্ঠায় তালিব ওয়ালীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এমনতর যদৃচ্ছ বিন্যাসে যে he was a disciple of Seraj

Shah, and both were born at the village Harishpur, Sub-division Jhanaidah, District Jessore···where he died some ten years ago.

ওয়ালীর মূল উদ্বৃতি বিচার করলে দেখা যাবে আবু তালিব···চিহ্ন দিয়ে যে ফাঁক রেখেছেন তাতে লেখা আছে—

> Having travelled long and made pilgrimages to Jagannath and other shrines, and met with all sorts of devotees, he at last settled at Mauza Siuriya, near the sub-divisional headquarter of Kushtiya (Nadiya). Here he lived, feasted, sang and worshipped and known as a Kayastha and where he died some ten years ago.

অধ্যাপক তালিবের অভিসন্ধিমূলক অনুদ্বৃতি কী ভয়ানক উদ্দেশ্য বহন করছে। তালিবের উদ্বৃতি অনুসরণ করলে তো মনে হবে লালনের মৃত্যুও হয়েছিল যশোহরের হরিশপুরে। তাই নয় কি?

এইসব দেখে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে ১৮৯০ সালে প্রয়াত লালন ফকির সম্পর্কে হঠাৎ ১৯৫৩ সাল থেকে যে আবু তালিবদের উৎসাহিত হতে দেখা গেল তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয় তো? খুব তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে—১৯৫৩ সাল নাগাদ তাঁকে মুসলমান বলে দাবি ওঠে; ১৯৬৩ সালে লালনের দীন সমাধি সৌধে রূপান্তরিত হয় ইসলামি আদলে এবং ১৯৬৭ সালে এস. এম. লুৎফর রহমান হঠাৎ প্রকাশ করেন এক কলমি পুথি "লালনচরিত"। এই "লালনচরিত" পয়ারে লেখা ১৪৮ পংক্তি লালনজীবনী, রচয়িতা লালনশিষ্য দুদ্দু শাহ। তাতে লালনের মুসলমানিত্ব, সিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ, পিতামাতার নাম, হরিশপুরের জন্মসূত্র সবই সুচারুভাবে সংগ্রথিত। অনেকের মতে পুঁথিটি জাল।

জাল কিংবা জনজাল যাই হোক, লালনচর্চার ইতিহাস যাঁরা জানতে চান, তাঁদের পক্ষে এই কলমি পুঁথির প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। এ সংক্রান্ত

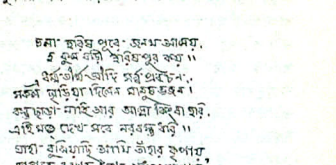

দুদ্দু শাহের পুঁথির শেষ পৃষ্ঠার প্রতিচিত্র। কৃতজ্ঞতা: "লালন-জিজ্ঞাসা"। লুৎফর রহমান

নানা উতোর-চাপান থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে ষাটের দশকে পূর্ব-পাকিস্তানে লালনকে নিয়ে কতখানি পরিকল্পনার জাল বিছানো হয়েছিল।

ঢাকার "সাহিত্য পত্রিকা"-র বর্ষা ১৩৭৪ সংখ্যায় সর্বপ্রথম এস. এম. লুৎফর রহমান 'লালন শাহের জীবনকথা' নামে দুদ্দু শাহ লিখিত কলমি পুঁথির ৫ পৃষ্ঠার সবটুকু প্রকাশ করেন। দুদ্দু শাহ (১৮৪১-১৯১১) ছিলেন লালনের শিষ্য। ছেঁউড়িয়ায় লালনের আখড়াতেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে, অর্থাৎ বাউল মত গ্রহণের পর আর ঘরে ফেরেন নি তিনি—

এমন ধারণা দিয়েছেন লুৎফর রহমান। রহমান আরও জানিয়েছেন: '১৩০৩ সালের ১লা কার্তিক এই ছেঁউড়িয়া আখড়ায় বসেই তিনি তাঁর গুরুর জীবনী গুরুর নিষেধ লংঘন করে রচনা করেন।' ১২৯৭ সালের ১লা কার্তিক লালনের প্রয়াণ ঘটে, কাজেই বোঝা যাচ্ছে গুরুর মৃত্যুর ৬ বছর পরে দুদ্দু লালনজীবনী লেখেন। গুরুর নিষেধ শিষ্য কেন লঙ্ঘন করলেন সে বিষয়ে শিষ্যের বক্তব্য:

> বহুদিন সেইকথা রাখিনু ঢাকিয়া।
> সাঁইজির ছিল মানা নাই প্রকাশিবা॥

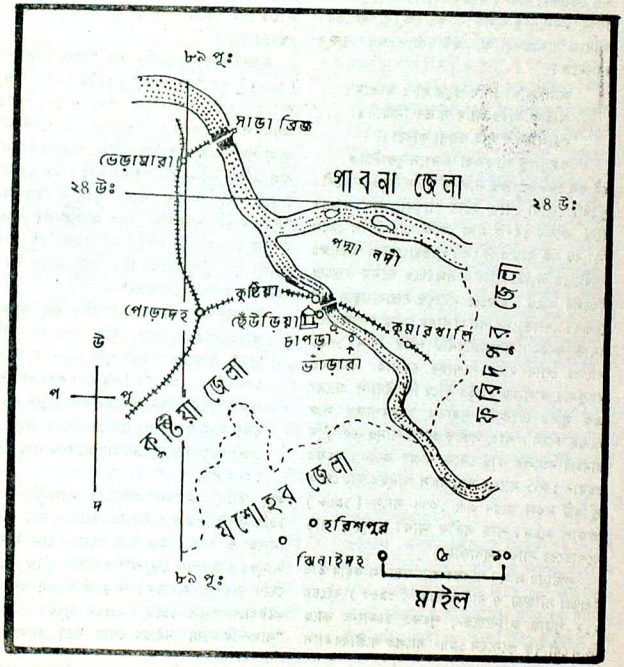

নাহি জানি কবে আমি যাইব চলিয়া।
তাঁর আত্মকথা যাইবে গোপন হইয়া॥
এ কারণে শেষ কালে লঙ্গি তার বাণী।
একান্ত বিনয়ে লিখি তাঁর জীবনী॥

দেখা যাচ্ছে ছেঁউড়িয়া আশ্রমে লালনের ঘনিষ্ঠ সেবক শিষ্য ভোলাই, শীতল, মহরম, মানিক বা কুধু সা-কে লালন তেমন কিছু বলেন নি কিন্তু দুদ্দুকে বলেছেন। কোথায় বলেছেন? না, ছেঁউড়িয়াতে নয়। দুদ্দুর জবানিতে :

আলমডাঙ্গা গ্রামে শুকুর সা-র আশ্রমে।
আরজি করিনু আমি অতিব নির্জ্জনে॥
দয়াল দরদি সাঁই করুণা করিয়া।
কহ কিছু আত্মকথা এ দাসে বুঝাইয়া॥

এই হল ১৪৮ পংক্তির লালনজীবনীর উদ্‌ভবকাহিনী। পুঁথিটি কোথা থেকে হঠাৎ পাওয়া গেল জানতে ইচ্ছে করে। ১৩০৩ সাল থেকে তার হদিশ মেলে নি। বহু বহু বছর পরে সেটি পাওয়া গেল পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপের উলটো পারে চরব্রহ্মনগরে জনৈক রামচন্দ্র মণ্ডলের কাছে। রামচন্দ্র নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহী বৈষ্ণব। দেশভাগের পর যশোহর থেকে চরব্রহ্মনগরে বসতি করেন। লালনজীবনীর পুঁথি তিনি ১৩৫১ সালের পৌষ মাসে যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার কালীগঞ্জ হাটের কাছে বিষাইখালি গ্রামের এক মুদির দোকানে পুরাতন কাগজপত্রের সঙ্গে সংগ্রহ করেন। শাহ্ লতীফ আফী আনহু এই পুঁথি রামচন্দ্র মণ্ডলের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। লুৎফর রহমান ১৩৭১ সালের মাঘ মাসে আনহুর কাছ থেকে পুঁথিটি নকল করেন এবং ১৩৭৪ সালে (১৯৬৮) প্রকাশ করেন। শাহ লতীফ আফী আনহু-র বাড়ি যশোহরের নারিকেলবাড়িয়া।

কুষ্টিয়ার লালন গবেষক আনোয়ারুল করীম তাঁর "বাউল সাহিত্য ও বাউল গান" (১৯৬৩) বইয়ের ২১২ পৃষ্ঠায় জানিয়েছেন, লুৎফর রহমানের কাছে তিনি মৌখিক শুনেছেন ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে যে, 'আসল পুঁথি জনাব শাহ্ আবদুল লতীফের কাছে আছে।' এদিকে ১৯৭৪ সালে "কুষ্টিয়ার বাউল সাধক" (১৯৭৪) বইয়ের ৭২ পৃষ্ঠায় লেখক আবুল আহসান চৌধুরী জানিয়েছেন : 'সম্প্রতি আমি এই পুঁথি স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করায় বলা হয়েছে এটি শাহ আবদুল লতীফ আফী আনহুর গৃহে অগ্নিকাণ্ডের ফলে অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে দগ্ধীভূত হয়েছে।'

অন্যপক্ষে লুৎফর রহমান তাঁর "লালন-জিজ্ঞাসা" (১৯৮৪) এবং "দুদ্দু শাহ্" (১৯৮৯) বইয়ে দুদ্দু শাহের স্বহস্তলিখিত পুঁথির প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার অনুলিপি ছেপেছেন। রহমানের লালনজীবনী প্রকাশিত পর আবু তালিব এটিকে 'প্রামাণ্য দলীল' বলে চিহ্নিত করেন তাঁর "লালন শাহ : মত ও পথ" নিবন্ধে, যা প্রকাশ পায় পূর্ব পাকিস্তানের "সাহিত্যিকী" পত্রিকার ১৩৭৩ সালের শরৎ-বসন্ত সংখ্যায় (রহমান এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে আবু তালিব মূল পুঁথি দেখেন নি। তার প্রমাণ কী? রহমান এ ব্যাপারে লিখেছেন[৪]—

> উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সম্পাদক দুদ্দু শাহের পুথির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—এটি 'তুলট কাগজের কলমী পুথি।.....রচনাকাল ১৩০৬ (=১৮৯৯)'। কিন্তু সত্য কথা এই যে, পুথিটি আদৌ তুলট কাগজের কলমী পুথি নয়; বৃটিশ আমলের মিলের কাগজে বইয়ের আকারে লেখা পাণ্ডুলিপি। রচনাকালও ১৩০৬ সাল নয়, ১৩০৩ সাল।

আবু তালিব আসলে রহমানের লালনজীবনীকে ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত ও উদ্‌ধৃতি করেছেন তার নানা নিবন্ধে ও গ্রন্থে, কিন্তু ভান করেছেন যেন আফী আনহুর কাছ থেকে দুদ্দু শাহ-র কলমী পুঁথি নিজে দেখে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর এই কাপট্য একেবারে সমূলে ভেঙে দিয়েছেন লুৎফর রহমান "লালন-জিজ্ঞাসা" বইয়ের শেষে আবু তালিব ও আফী আনহু-র দুটি প্রাসঙ্গিক চিঠির ফটোকপি ছেপে দিয়ে। চিঠি দুটির বিবরণ ও বক্তব্য পাঠকদের সামনে হাজির করছি এইটা বোঝাতে যে লালনকে নিয়ে সত্তরের দশকে বাংলাদেশে কেমন ছেলেখেলা হয়েছে।

প্রথম চিঠি লিখেছেন আবু তালিব, আফী আনহুকে। তার কিছু অংশ :[৫]

> যথাসম্ভব শীগ্‌গীর দুদ্দু শাহ লিখিত লালন-জীবনীর একটি কপি পাঠিয়ে সুখী করবে। ও সম্পর্কে এ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা লিপিবদ্ধ করার বাসনা রয়েছে। তোমার ব্যক্তিগত মতামতও সেই সংগে জানিয়ে সুখী করবে।
>
> আচ্ছা, পুথিখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা কি মাত্র ৪? ছত্র সংখ্যা কত? দুদ্দু শাহ্ কতবছর বয়সে এটি রচনা করেন? আচ্ছা, লালন শাহের দাদাপীরের নাম 'আমানত উল্লাহ শাহ' এ-কথা কি দুদ্দু শাহ তাঁর পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ করেছেন? আমানত উল্লাহ শাহের কোনো পরিচয় দিতে পারো কি? আল্লাহ্ হাকিম।
>
> ইতি—শুভাকাংখী (sic)
> মুহম্মদ আবু তালিব

এই চিঠির মধ্যে লালনের দাদাপীর (অর্থাৎ গুরুর গুরু) আমানত উল্লাহ শাহ-র প্রসঙ্গটি পাঠকদের বোঝা দরকার। আসলে লুৎফর রহমান তাঁর এম. এ. পরীক্ষার জন্য এক অভিসন্দর্ভ ("লালন শাহ—জীবন ও গান") ১৯৬৫ সালে রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জমা দেন। তাতে ইচ্ছাকৃতভাবে লালনজীবনীর কিছু তথ্য তিনি ভুলভাবে পরিবেশন করেন কেননা আশঙ্কা ছিল যে 'ভবিষ্যতে তাঁর এই বিশেষ পত্র থেকে অন্যে মাল-মশলা সংগ্রহ করে খ্যাতি অর্জন করতে পারে।' রহমানের অনুমান যে সেটাই সত্যি হয়েছে। যেমন এই আমানত উল্লাহ-র প্রসঙ্গ রহমান লিখেছেন :

অভিসন্দর্ভে লালন-গুরু সিরাজ শাহের গুরু আমানত উল্লাহ্ শাহের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তথায় তাঁর কোন পরিচয় প্রদত্ত হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থের উক্ত তথ্যটি গ্রহণ ক'রে জনাব আবু তালিব আমানত উল্লাহ্ শাহের পরিচয় জানার জন্য শাহ্ লতীফ আফী আনহুকে চিঠি লেখেন। তিনি তাঁকে এ বিষয়ে কি তথ্য সরবরাহ করেছেন—জানিনা; তবে লক্ষণীয় যে, লেখক 'লালন শাহ : মত ও পথ' [১৯৬৬] প্রবন্ধে আমানত উল্লাহ্ শাহের কোন পরিচয় প্রদান করেন নি, কিন্তু 'লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৬৮) লিখেছেন—"আমানত উল্লাহ্ শাহ্ চট্টগ্রাম নিবাসী ছিলেন।' বলাবাহুল্য, চট্টগ্রামের আমানত উল্লাহ্ শাহ্ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। তাঁর সঙ্গে সিরাজ-গুরু আমানত উল্লাহ্ শাহ্ ওর্ফে আমিনদ্দী নেড়ার কোন সম্পর্ক নেই। চট্টগ্রামের চিশ্‌তিয়া তরিকার ফকির আমানত উল্লাহ্ শাহ্‌কে যশোরের ভিন্ন তরিকান্তর্গত সিরাজ শাহের মাথায় বসিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উত্তম গজমুণ্ডগণেশের সৃষ্টি করা হয়েছে—এমনকি, কে পূর্ববর্তী এবং কে পরবর্তী সে অনুসন্ধানটুকুরও কোন প্রয়োজন হয় নি।[৬]

লুৎফর রহমানের বই থেকে অন্য যে চিঠির এবারে সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃতি দিচ্ছি সেটি রহমানকে লিখেছেন আফী আনহু। তিনি ১৯৬৭ সালের ২৬ জুন স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন :[৭]

> পরম প্রীতিভাজনেষু,
>
> শুভেচ্ছা নেবেন। আপনার ইংরেজী ১৭. ৬. ৬৭ তারিখের চিঠি পেয়ে সবিশেষ অবগত হয়েছি। নানা কাজের জন্যে জবাব দিতে দেরী হয়ে গেল। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবু তালিব সাহেবকে আমার সংগৃহিত আচার্য্য দুদ্দু শাহ লিখিত লালন শাহের

জীবনী সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি কখনো দেখাইনি বা তিনি কখনো দেখেন নি। কুশল নেবেন।

গুণমুগ্ধ

শাহ্ লতীফ আফী আনহু

এ চিঠির পর পরিষ্কার বোঝা যায় যে আবু তালিব হুদ্দু শাহের কলমি পুঁথি কখনই দেখেন নি। রহমান বেশ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে অধ্যাপক তালিব স্বভাবত কোনো মূল গ্রন্থ বা নিবন্ধ না দেখেই তার বরাত দিয়ে থাকেন। যেমন ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর "লালন শাহ্ ও লালনগীতিকা" (বাংলা একাডেমী-র আনুকূল্যে রচিত ও প্রকাশিত) বইয়ের প্রথম খণ্ডের ২২৮ পৃষ্ঠার ভূমিকায় অনেক দক্ষতার পরিচয় আছে কিন্তু আবদুল ওয়ালীর বিখ্যাত ইংরাজি নিবন্ধ এবং "হিতকরী"-র সম্পাদকীয় যে তিনি দেখেন নি তার প্রমাণ স্পষ্ট।

আসল ব্যাপারটি খুব গোলমেলে। আবু তালিব যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লুৎফর রহমান তখন এম. এ. ক্লাশের ছাত্র। ছাত্র হিসাবে লালনশাহ সম্পর্কে যে অভিসন্দর্ভ তিনি জমা দেন তাতে হুদ্দু শাহের কলমি পুঁথির প্রথম ৪ পৃষ্ঠা (পুঁথিটি মোট ৫ পৃষ্ঠার) থেকে নানা তথ্য উদ্ধৃত করেন। উদ্ধৃতির ব্যাপারে রহমান ইচ্ছা করেই কিছু-কিছু ফাঁক রাখেন, কিছু কূটকৌশল অবলম্বন করেন এবং আবু তালিব সেই ফাঁদে পা দেন। তালিব তাঁর লালন সংক্রান্ত দুটি বইয়ে রহমানের (তখনও পর্যন্ত অমুদ্রিত) তথ্য যদৃচ্ছ ব্যবহার করেন কিন্তু তাঁর প্রয়াস ধোপে টেকে নি। লুৎফর রহমান তির্যক ভাষায় তালিবকে 'শতাব্দী-শ্রেষ্ঠ-কুম্ভীলকবৃত্তি দক্ষ' বলে অভিহিত করে শেষে লিখেছেন :

> আমিই তাঁকে প্রথম হুদ্দু শাহের পুথির অংশ বিশেষের নকল দিলেও এবং আমার-ই প্রবন্ধ থেকে তিনি হুদ্দু শাহের পুথির সমস্ত উদ্ধৃতি চয়ন করলেও—পাদটীকায় তিনি আমার বদলে, শাহ্ লতীফ আফী আনহুর বরাত দিয়েছেন—'যশোর নিবাসী আবদুল লতীফ আফী আনহু [হওয়া উচিত শাহ্ লতীফ আফী আনহু] সংগৃহীত হুদ্দু শাহের "লালন চরিত" বিষয়ক একখানি কলমী পুথি থেকে।'···যে কলমী পুঁথি তিনি আজও চোখে দেখেন নি, উক্ত পাদটীকায় তিনি সেই পুঁথির সেই পাণ্ডুলিপি ব্যবহারের দাবি রেখেছেন। কিমাশ্চর্য অতঃপরম্।

এইসব উতোর-চাপানে আমাদের মতো লালন-অনুরাগীদের কিছু এসে যায় না, কিন্তু ইতিহাসের খাতিরে সবকিছু জেনে রাখা দরকার। এখানে এই দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ তর্কবিতর্কের বিবরণ থামিয়ে সার কথা এই বলা চলে যে, লালন ফকির যে জন্মগতভাবে মুসলমান, তাঁর বাড়ি যশোরের হরিশপুরে এবং তিনি বাউল নন, সুফিসাধক—এই তিন সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন আবু তালিব, এস. এম. লুৎফর রহমান ও খোন্দকার রিয়াজুল হক এই তিনজন। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হবে আরেক সহায়কের নাম—তিনি শাহ্ লতীফ আফী আনহু। লালনজীবনীর বিতর্কিত কলমি পুঁথি (যা ব্যবহৃত, পরে দগ্ধীভূত) তাঁরই আবিষ্কার। এই কজনের মধ্যে আফী আনহুর বাড়ি যশোরের নারিকেলবাড়ি, লুৎফর রহমানের বাড়ি যশোরের খাটর গ্রাম। খোন্দকার রফিউদ্দীন নামে যশোরের খোদ হরিশপুরের এক ব্যক্তি (সাধক গীতিকার পাঞ্জু শাহের পুত্র) এঁদের সমর্থনে নিবন্ধ লিখেছেন। আবু তালিব ও খোন্দকার রিয়াজুল হকের বাড়ি ঠিক কোন্ জেলায় এখনও জানতে পারি নি। তবে প্রখ্যাত বাউলবিশেষজ্ঞ আহমদ শরীফের একটি মন্তব্য প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন :[৮]

> এ আত্মকথা যে বানানো তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ চব্বিশ পরগণা বিভক্ত হয়ে ১৮৮৬ সনে যশোহর জিলা গঠিত হয়। হুদ্দু বলছেন, ১১৮৯ সালের পয়লা কার্তিকে লালনের জন্ম হয় অর্থাৎ ১৭৭২ সনে বা খ্রীষ্টাব্দে। তাহলে লালনের জন্ম হয় ২৪ পরগণা জিলার খুলনা মহকুমায় (১৮৬০-৬১ সনে গঠিত), এবং খুলনা জিলার রূপ পায় ১৮৮২ সনে। ১৮৮৩ সনে নদীয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে বনগাঁও-কে যশোরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। উনিশ শতকের শেষ দশকে বৃদ্ধ হুদ্দুর এসব খবর জানা থাকা উচিত ছিল। ঝিনাইদহ প্রথমে খুলনা মহকুমাভুক্ত থাকে, পরে যশোহর জিলা-ভুক্ত হয়। * এসব কারণে হুদ্দুর নামে একালের কোন স্বল্পবুদ্ধি যশোহরী ও ইসলামগৌরবগর্বী গবেষকই এ জীবনী তৈরী করেছেন বলে আমাদের ধারণা। এতে ছেঁড়িয়ার, হিন্দুর ও বাউলের দাবি বাতিল করে ঝিনাইদহের, হরিশ্চরের, ও সুফীর দাবি প্রতিষ্ঠা সম্ভব ও সহজ বলে মনে করা হয়েছে। আহমদ শরীফ ছাড়া আরও অনেক গবেষক হুদ্দু শাহ-র নামে প্রচারিত পুঁথির প্রামাণিকতা বিষয়ে সন্দেহ তুলেছেন। বিশেষত এর ভাষা ও শব্দব্যবহার অনেকের কাছে তৎ-কালোচিত মনে হয় নি। বিশেষত হুদ্দু শাহ্ একজন লালনপন্থার নামী গীতিকার। তাঁর গানের ভাষা ও ভঙ্গীর যে সবল আধুনিকতা, যে মননশীলতা, তার সঙ্গে কলমি পুঁথির একে-বারে মিল নেই—এমন আমাদের মনে হয়। কথাটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাই।

হুদ্দুর নামে প্রচারিত ১৪৮ পংক্তির পুঁথি চৌদ্দ মাত্রার পয়ারে বাঁধা। কিন্তু বহু চরণে মাত্রাসংখ্যার কম বেশি বিন্যাস খুব নিচু স্তরের ছন্দজ্ঞান, কবিত্বের বা কাব্যরচনাকুশলতার পরিচয় দেয়। কয়েকটি নমুনা :

১. ধন্য-ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাই।
পতিত জনার বন্ধু তাঁর গুণ গাই॥

২. এ কারণে শেষকালে লঙ্গি তাঁর বানী।
একান্ত বিনয়ে লিখি তাঁর জীবনী॥

৩ সাইর লীলা কিছুমাত্র বুঝা নাহি যায়।
প্রতি একজনার মাঝে লালন দেখায়॥

এমন অসার কবিত্বে ভরা দুর্বল রচনার পাশে এবারে দেখা যাক হুদ্দু শাহ্-র মারফতি গানের চারটি নমুনা :

১. নারী ভজনের গোড়া তত্ত্বের নিরূপণ
যুবতী দর্শন মাত্রে কালিকা দর্শনং ভবেৎ
শিবের বচন।

২. শুধু রে ভাই জাতাজাতির দোষে
ফিরিঙ্গিরা রাজা হল এদেশে এসে।
হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান
পরস্পরের হিংসায় দিল প্রাণ
তাইতে তো পাদ্রী খ্রীষ্টান
যীশুখ্রীষ্টের দীন প্রকাশে॥

৩. মোহাম্মদের জন্ম যদি হত এদেশে
বেহেশ্তের কোন্ ভাষা হত বলতে এসে॥
মাতৃভাষা ত্যাজে সবাই
আরবী ভাষা শিখলে রে ভাই
তাতে হায় ফায়দা তো নাই অবশেষে॥

৪. এদেশের মুসলমানে বড়াই করে
আমরা বাদ্শাই জাতির খান্দান রে।
সহস্র বৎসর পূর্বে ভাই
মুসলমানের গন্ধ দেখি নাই
যত অনার্য শূদ্র ওরাই
ধর্ম ভারত হয় রে॥

এসব পদ পড়লে বোঝা যায় উনিশশতকীয় গীতিকার হুদ্দু ছিলেন মুক্তমনা, সমাজসচেতন ব্যক্তিই। ইতিহাস সম্পর্কে সতর্ক, মুসলিম সমাজের জাত্যহঙ্কার নিয়ে ব্যথিত, হিন্দু শাস্ত্র বিষয়েও অধীত ব্যক্তি। যুগধর্মে

* হুদ্দুর কলমি পুঁথির পাঠে আছে :
এগারোশো উনআশী কার্তিকের পহেলা।
হরিষপুর গ্রামে সাঁই-র আগমন হইলা॥
যশোহর জেলাধির ঝিনাইদহ কয়।
উক্ত মহকুমাধিন হরিষপুর হয়।

কিছু ইংরাজি শব্দও ('খ্রীষ্টানেরা বলে মোরা হেভেন পাবো') তাঁর গানে এসে গেছে। দুদ্দু'র গীতাবলী পড়লে স্পষ্ট হয় যে, তিনি যথার্থই লালনপরম্পরার বাউল, বস্তুবাদী ও দেহতত্ত্বের সাধক। তাই লিখেছেন :

বস্তুকেই আত্মা বলা যায়
আত্মা কোন অলৌকিক কিছু নয়॥

এত স্বচ্ছ যাঁর ধারণা, এমন স্বতঃস্ফূর্ত যাঁর প্রকাশ-কৌশল তিনি অমন দুর্বল ভাষায় দুর্বল ছন্দে লালন-জীবনী লিখবেন কেন? কাজেই 'ইসলামগৌরবগর্বী' সাম্প্রতিক কালের কিছু যশোরবাসী পরিকল্পনা করে লালনজীবনী চালু করেছেন এই মত উড়িয়ে দেওয়া কঠিন।

দুদ্দু শাহ-র নামে প্রচারিত পুঁথিতে লালনের পিতৃপরিচয়ে লেখা আছে—'দবীরুল্লাহ দেওয়ান তার আব্বাজীর নাম'। এ প্রসঙ্গে এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দীন বলেছেন :[৯]

> ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে গ্রাম বাংলায় 'আব্বা' শব্দটি মোটেই পরিচিত ছিল না। পল্লীর সাধারণ ঘরেও ত দূরের কথা শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারেও উহা ব্যবহার হইত কিনা সন্দেহ। এই শব্দটি অতি আধুনিক কালে প্রচলিত হইয়াছে।
>
> দুদ্দু শাহর সমসাময়িক কোন গ্রাম্য কবির কবিতায় দূরের কথা, কোন খ্যাতনামা কবির কবিতায়ও "আব্বা" শব্দ ব্যবহারের নজীর নেই।

আহম্মদ শরীফ অন্য প্রশ্ন তুলেছেন। লালনের পিতা দবীরুল্লাহ প্রসঙ্গে তাঁর জিজ্ঞাস্য—'দবির কোন্ ভাষার শব্দ—এর অভিধা কি?—দবীরুল্লাহ কি?'

কাজেই বোঝা গেল এস. এম. লুৎফর রহমান ও তাঁর তথ্য ব্যবহারকারী আবু তালিব যতই ঘোষণা করুন, তবু লালন সম্পর্কে পুরানো বহুপ্রচলিত কাহিনী ও সিদ্ধান্তের নড়চড় হওয়া কঠিন। অন্তত গরিষ্ঠসংখ্যক পণ্ডিত ও গবেষক নতুন কাহিনী মানেন নি। নতুন কাহিনী, যার ভিত্তি এক বিতর্কিত কলমি পুঁথি, তা অধুনা আবার দগ্ধীভূত। কিন্তু নতুন কাহিনী ও সিদ্ধান্ত যাঁরা প্রচার করছেন তাঁদের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হলে লালনজীবনের নতুন মিথটা জানা দরকার। সেটা সংক্ষেপে এইরকম—

১১৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অধীন হরিশপুরে লালনের জন্ম। তিনি মুসলমান বংশীয়। তাঁর দাদাজির নাম গোলাম কাদের। পিতা দবীরুল্লাহ দেওয়ান, মাতা আমিনা খাতুন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন। এক বৈশাখ মাসে লালন যখন পথে বসে ছিলেন তখন সিরাজ সাঁ দরবেশ (বাড়ি হরিশপুর, জীবিকা পাল্কিবহন) তাঁকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেন, শিষ্য করেন ও মানুষ-তত্ত্বে দীক্ষা দেন। লালনের ছাব্বিশ বছর বয়সে সিরাজ সাঁ মারা গেলে ফকিরের বেশে লালন নবদ্বীপে যান। সেখানে পদ্মাবতী নামে একজন নারী তাঁকে আশ্রয় দেন। তারপর একদিন নবদ্বীপের পণ্ডিত-সভায় কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে লালন চমক সৃষ্টি করেন। প্রথমে যেসব পণ্ডিত তাঁকে অবজ্ঞা করেছিলেন তাঁরা মার্জনা চান। তারপরে কাশী-বৃন্দাবনে গেলে ভক্তরা সবাই তাঁকে যুগাবতার আখ্যা দেন। এবারে তিনি ভ্রমন করতে গেলেন খেতুরি। সেখান থেকে গেলেন দক্ষিণ-পূর্ব দেশে। সেখানে লালনের হল বসন্তব্যাধি। ভক্তবৃন্দ সঙ্গে না থাকায় মাঝিরা তাঁকে নদীতে ফেলে দিল। ভাসতে ভাসতে তিনি অচেতনভাবে উপস্থিত হলেন কালিগঙ্গার তীরে ছেঁউড়িয়া গ্রামের পাশে। অচেতন ভাসমান তাঁর দেহ দেখে মলম নামে একজন লালনকে উদ্ধার করে দুধ পথ্য দিয়ে একমাস সেবা করেন। একদিন মলম যখন কোরান পাঠ করছিলেন তখন লালন তাঁর ভুল ধরে দেন। বিস্মিত চমকিত মলমের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন তাঁর কোনো লেখাপড়া নেই, মুর্শিদের কাছ থেকে যেটুকু শিক্ষা তাঁর তাতেই যা কিছু বয়ান করেন। মলম সা লালনকে গুরু বলে মেনে নিলেন। বাড়ির তেঁতুলতলায় মুর্শিদের সেবাসত্র বানিয়ে দিয়ে

মলম ও তাঁর পত্নী লালনের সেবার কাজে রত হলেন। ইত্যবসরে লালনের বয়স হয়েছে তেতাল্লিশ। নানা দিক থেকে আসতে লাগল বহুবহু ভক্ত শিষ্য সেবক। কেউ কেউ ধর্মীয় 'বাহাস্' বা তর্ক করতেও আসতেন। এমনতর যেসব শিষ্যসেবক তাঁর জুটেছিল তাদের নাম চক্কর-ফক্কর মানিক মলম কোরবান মনিরুদ্দিন এবং আরও বহুতর প্রভুর গোলাম। আর স্বয়ং দুদ্দু শাহ? তিনি লালনের সঙ্গে বাহাস করতে গিয়ে বায়াত (শিষ্য) বনে গেলেন। অতঃপর ১২৯৫ বাঙলা সালের ১লা কার্তিক, শুক্রবার দিনের শেষে লালনের জীবনাবসান।

কাহিনীটি ভারি সাদামাটা। কেবল খটকা লাগে কয়েক জায়গায়। যেমন দুদ্দু-র মতে লালনের জন্ম ও মৃত্যু দুইই ১লা কার্তিক। বসন্ত রোগাক্রমণের ঘটনার আগেই সিরাজ-সংসর্গ, দুজনের একই গ্রামে বাড়ি, সিরাজের মৃত্যু সবই কেমন বানিয়ে তোলা। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য তা হল ৪৩ বছর বয়সে ছেঁউড়িয়া আগমনের পর ১১৬ বছর বয়স অবধি দীর্ঘজীবী লালন সম্পর্কে পুঁথির আশ্চর্য নীরবতা। এমনকি লালন যে একজন বড়ো গীতিকার, তাঁর কণ্ঠ যে সর্বদাই স্বভাবত গানে মুখরিত থাকত, সেসব উল্লেখমাত্র নেই। তাই সবদিক বিচার করে আহমদ শরীফের কথার উদ্‌ধৃতি দিয়ে বলা যায় :

> একে প্রয়োজনে পরিকল্পিত দলিল বলেই মনে করি··· । মতলবে দলিল বানানোর জন্যে যেসব কথা আবশ্যিক বিবেচিত হয়েছে ঠিক সে কথা-গুলোই রয়েছে। অথচ স্বতোস্ফূর্ত রচনা হলে ভক্ত হৃদয়ের আবেগ উচ্ছ্বাসময় অলীক ও অলৌকিক কিছু গল্প-কাহিনী-ঘটনার বয়ান থাকত। ···জীবিতকালেই যাঁর পরিচিতি গোপন রইল, মৃত্যুর পরে তা' জানানোর প্রয়োজনটাই বা কি ছিল? কার আগ্রহে প্রয়োজনে এ প্রয়াস ও প্রকাশ?—এমনি অনেক জিজ্ঞাসা জাগে।

এসব জিজ্ঞাসার জবাব বাংলাদেশের পণ্ডিতরাই পান নি। তাঁদের বিভ্রান্ত জিজ্ঞাসা এখানে কিছু নমুনা হিসাবে পেশ করা চলে। এ. এইচ. ইমামউদ্দিন লক্ষ করেছেন যে আবু তালিব তাঁর দুখানি বইয়ে লালনের বাল্যজীবনের দুরকম ভাষ্য দিয়েছেন। ইমামউদ্দিন দেখাচ্ছেন, "লালন শাহ ও লালনগীতিকা" (১ম খণ্ড মে ১৯৬৮/২য় খণ্ড অগস্ট ১৯৬৮) বইতে তালিব জানিয়েছেন :

> সাঁইজির বাল্য ও শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানবার উপায় নাই। তবে যতদূর জানা যায়, অতি অল্প বয়সেই বাপ-মা হারান।··· বড় দুই ভাইয়ের সংসারে লালিত পালিত হতে থাকেন। ভাইয়ের সংসার সচ্ছল ছিল না। তাই লেখাপড়া শেখার তেমন সুযোগ তাঁর ঘটে নাই। গরু চরানোই তাঁর কাজ ছিল। এমনি গরু চরানো কালে একদিন স্বীয় গ্রামের সিরাজ বেহারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

এখানেই শেষ নয়। আবু তালিব জনশ্রুতি সম্বল করে এমনও জানিয়েছেন দবীরুল্লাহ দেওয়ানের চারটি সন্তান—কলম, আলম, লালন, চলম। ১৯৭৬ সালে এক প্রবন্ধে তালিব চলম নামটি প্রত্যাহার করেছেন।

কি আশ্চর্য, এই আবু তালিবই তাঁর "লালন পরিচিতি" (সেপটেম্বর ১৯৬৮) বইতে লালনের 'আসল জীবন-কথা' নামে যে নতুন কাহিনী বিন্যাস করেছেন তা একেবারে অন্য ধাঁচের। তাতে বলা হচ্ছে—

> যশোর জিলার হরিশপুর গ্রামের এক নিঃস্ব গুণী সিরাজ বিহারা একটি ইয়াতীম [বাপ-মা মরা] শিশুকে কুড়িয়ে পেয়েছে।···কার ছেলে এ? পরিচয় জানা যায়, উক্ত গ্রামেরই মরহুম দবীরুল্লাহ দেওয়ানের ভাগ্যহীন সন্তান। সংসারে দুই ভাই ও ভাবী আছে বটে, তবে তারাও নিতান্ত গরীব এবং শিশুটিও খাপছাড়া। ···তাই সে ভাইয়ের সংসার ত্যাগ করেছে। ···তার অপূর্ব সুরের

> মূর্চ্ছনায় মোহিত হয়ে এবং তার অসহায়তার কথা ভেবে সিরাজ তাকে ঘরে আশ্রয় দিয়েছে। ছেলেটিকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করতেও তাই সে কৃতসংকল্প হয়েছে।

সন্দেহ কি! যে, এ রকম গালগল্প পড়ে বিস্মিত ইমামউদ্দিন তাঁর বইতে সংগত প্রশ্ন তুলবেন?—

> সিরাজ যে ছেলেটিকে কুড়াইয়া পাইলেন, সে ছেলেটি তাহারই নিজ গ্রামের। সে যে দবীরুল্লাহ দেওয়ানের পুত্র, সে পরিচয় পাওয়ার পরও ছেলেটিকে ফেরৎ দেওয়া হইল না। ছেলেটির দুইটি ভাই ও ভাবী আছে অথচ তাহারাও ছেলেটির কোন খোঁজ লইল না বা তাহাকে বাড়িতে লইয়া আসিল না। একজন সম্ভ্রান্ত দেওয়ান বংশের ছেলে একজন পাল্কিবাহকের বাড়িতে পোষ্য-পুত্ররূপে রহিল।

আবু তালিবের 'আসল জীবন-কথা' আসলে লালনকে নিয়ে দারুণ পরিকল্পনায় গাঁথা। তা ক্রমে বোঝা যায় "লালন পরিচিতি" নামের নিরীহদর্শন চটি বইটি (মাত্র ৯৮ পৃষ্ঠার) পড়তে-পড়তে। যেমন ৪২ পৃষ্ঠায় তালিব লেখেন বেশ মুরুব্বিয়ানার চালে: 'সত্যি কথা বলতে কি লালন একজন কামিল দরবীশ ছিলেন।' এর পরে ৪৪ পৃষ্ঠায় এসে তিনি রায় দেন: 'আমার তো মনে হয়, লালনশাহী গীতিধারা বাংলা সাহিত্যে ফারসী সুফী সাহিত্যের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে।… তাই লালন শাহকে উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যের "রুমী" বলা যেতে পারে।' এবারে ৪৮ পৃষ্ঠায় আবু তালিব আসল কথাটা পেড়ে ফেলেন যে—

> তথাকথিত 'বাউল মত' ও 'সাধনতত্ত্ব' থেকে লালন শাহ ও তাঁর অনুসারী সম্প্রদায়ের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন; এবং এই মত আসলে ইসলামী সুফী-সাধনারই অনুকূল।

এবারে ৫৯ পৃষ্ঠায় তালিব আরেক পা এগিয়ে বলেন—

> ধরতে গেলে, বাংলা সাহিত্যে গযল-গীতিরও আদ্যগুরু ছিলেন লালন শাহ। লালন-গীতি মূলতঃ ফারসী গযল-গীতিরই নামান্তর। এদিক দিয়ে তিনি ফরাসী (sic) কবি হাফিজ-উমরখয়্যাম-রুমী প্রভৃতির ওয়ারিশ। উল্লেখযোগ্য যে, লালন-গীতি শুধুমাত্র গান নয়—এটি সাধনতত্ত্ব—সাধকের অধ্যাত্ম-জীবনবোধের প্রতীক। সুফী সাধকরা যাকে 'সিমা' সঙ্গীত বলেছেন, লালন-গীতি আসলে তাই। এই গান তাঁদের 'যিকরের' অন্তর্গত।

৬৪ পৃষ্ঠায় আরেক দুঃসাহসিক উক্তি করে বসেন—

> শুধু গানের ধারাতেই নয়, ভাবে-ভাষায়, রূপে-রসে লালন-গীতি বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব ফসলের ইশারা বয়ে এনেছে। এর এক ধারায় যেমন গযল-গীতি উৎসারিত হয়েছে, অন্য ধারায় আধুনিক বাউলগীতি নামে এক অভিনব গীতিধারার জন্ম দিয়েছে। প্রথম ধারার উত্তর-সূরী যেমন নজরুল ইসলাম, দ্বিতীয় ধারার শ্রেষ্ঠ গীতিকার তেমনি রবীন্দ্রনাথ।

আশ্চর্য নয়, শেষ পর্যন্ত তালিব লালনগীতিকে শনাক্ত করেন 'সুফী-সাহিত্যের আগ্নেয় অনুভূতির ফসল' বলে।

বিশেষ মতলবে বানিয়ে তোলা পুঁথি, বাউল-সাধককে সুফিসাধক ব'লে প্রচার করা, লালন-গীতিকে গজল গান বলা—সবই এক সুনিশ্চিত পরিকল্পনার নিগূঢ় যোগাযোগ। এমনতর মত প্রতিষ্ঠায় একদল ধর্মান্ধ মানুষ খুশি হলেও বেশির ভাগ লালন-অনুরাগী ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। অতিকল্পনা এতদূর পৌঁচেছে যে আবু তালিব লিখেছেন, লালন ছেঁউড়িয়ার আশ্রমে একটি মক্তব চালাতেন এবং নিজে ছাত্রদের কোরান শিক্ষা দিতেন। এসব কথা প্রচারের উদ্দেশ্য তিনটি। এক, লালনের হিন্দু উৎস-ফকিরি গ্রহণ-ভাঁড়ারাবাসী-বাউল এই চারটি বহুকথিত বিশ্বাসকে ধ্বংস করা। দুই, লালনকে ও সিরাজকে হরিশপুর তথা যশোরের মানুষ প্রমাণ করা। তিন, লালনের ইসলামি উৎস প্রতিষ্ঠা করে পরিণামে তাঁকে পরমনিষ্ঠ মুসলমান তথা সুফিপন্থী বানানো। এই কাজে বাংলাদেশের অন্যান্য কিছু পণ্ডিতেরও অন্য ধরনের সহযোগ লক্ষ করা যায়। যেমন অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম (অনুমান করি ইনি তরুণতর কেউ) লিখেছেন[10]:

> লালন মূলতঃ ছিলেন একজন লেখা-পড়া না জানা স্বভাব কবি।…তাঁর একটি কাব্যকর্মে তিনি আত্মাকে অচিন পাখী রূপে ব্যক্ত করেছেন। আত্মাকে পাখীর সাথে তুলনা করার এই ধারাটি বাংলা সাহিত্যেও যেমন প্রাচীনকাল থেকে লক্ষ্য করা যায় তেমনি বিশ্বসাহিত্যেও এর নজীর পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর ফারসী সুফী কবি হযরত ফরীদুদ্দীন আত্তারের কাব্যে "সী মোর্‌স" বা ত্রিশ পাখীর ধারণায় আত্মার বিকাশ শক্তির এক অপূর্ব উপমা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। রূহের (আত্মা) সম্পর্কে জানার জ্ঞান মানুষের নেই।……রূহের স্বরূপ জানার জন্য ইলমে তাসাওউফে একটি অনুশীলন অধ্যায় আছে যাকে বলা হয় মকামে ইনাবাত। এই মকামে বিশেষ নিয়মে মুরাকাবা করলে সাধক রূহের স্বরূপ জানতে পারে।… রূহের স্বরূপ তার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে যায়।……ইলমে তাসাওউফের দশটি লতিফার অন্যতম লতিফা হচ্ছে রূহ। এর স্থান হচ্ছে বুকের ডানদিকে। সুফী যখন নিজেকে জানতে পারে, যখন রূহের স্বরূপ তার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে যায় তখন…তার কাছে রূহ অচিন পাখী থাকে না। লালন সাধনার সেই জগতে বিচরণ করার সুযোগ পান নি। তাসাওউফ চর্চার মাধ্যমে শরীয়তের উপর অটল থেকে যদি আমাদের নিজকে জানার প্রয়াসে কঠোর সাধনা করি তাহলে অচিন পাখী আমাদের চেনা পাখীতে পরিণত হবে।

লালন যা চান নি, এখানে সেটা তাঁর অক্ষমতা বলে চালানো হয়েছে। শরীয়তে তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। তিনি ছিলেন মারফতে বিশ্বাসী। অচিন পাখির জন্য আকুলতাই তাঁর গানের বিষয়, সেটাই সৌন্দর্য। রূহকে তাসাওউফের কৃচ্ছ্রের মধ্যে দিয়ে জানলে লালন সর্বজ্ঞ সাধক হতেন হয়তো। ভাগ্যিস হন নি। তাই জেগেছে তাঁর আততিভরা গান।

বাংলাদেশের আরেক অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ সম্প্রতি একটা অন্যসুরের কথা বলেছেন। আবু তালিবের প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন[11]—

> তিনি দাবী করেন, লালন মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মধ্যযুগের মুসলমান গীতিকাররা রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বৈষ্ণবপদ লিখেছেন। নজরুল পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করে উত্তম শ্যামাসংগীত লিখেছেন। লালন শাহ হিন্দুয়ানী বিষয় নিয়ে গান রচনা করেছেন এমন এক উদ্দেশ্যে যেখানে সমাজ-সংস্কৃতি -ধর্মগতভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন। এসব যুক্তির ভিত্তিতে আবু তালিবের দাবীর যথার্থতা দেখতে হবে।

ওয়াকিল আহমদের মন্তব্যে বেশ সুকৌশল ভাঁজ আছে। মধ্যযুগের কয়েকজন গৌণ মুসলমান কবির বৈষ্ণবভাবাপন্ন গান রচনা আর আধুনিক কালের নজরুলের শ্যামাসংগীত রচনার (যার পনেরো আনা গ্রামোফোন কোম্পানির অর্ডারি ব্যাপার) দুই বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফাঁকে লালনের হিন্দুয়ানী বিষয়ে গান রচনাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য যে লালন অনেক বড়ো মাপের ভাবসাধক ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। হিন্দু-মুসলিম যুক্ত সংস্কৃতির চৈতন্য তাঁর গানে অন্তঃশীল লাবণ্যে মিশে আছে। তিনি সবরকম ধর্মের বেড়া পেরিয়ে গিয়েছিলেন। সেকথা না বুঝে ভ্রান্তমতি কেউ-কেউ তবু বলে যাচ্ছেন:

> লালন নিঃসন্দেহে সুফী-পন্থী ছিলেন এবং সেই কারণে কোরআন-হাদীস ও সুফীতত্ত্বের সংগে তাঁর চিন্তাধারার মিল পাওয়া যায়। কোরআন-হাদীস থেকে অনেক উদ্ধৃতি তাঁর গানে চোখে

পড়ে এবং তিনি স্বার্থকভাবে সে সবের ব্যাখ্যা করেছেন। তাতে বোঝা যায় যে, তিনি কোরআন-হাদীসে গভীর জ্ঞান রাখতেন, যা একজন বাউলের বা বাতুল বা পাগলের পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, সম্ভবও নয়।

অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসুল নামের এই ধর্মধ্বজী ব্যক্তির নিবদ্ধ আগাগোড়া পাঠ করলে বোঝা যায় ইসলামি শাস্ত্রের যে মারফতি ব্যাখ্যা লালন করেছেন তিনি তা অনুসরণ করতে তো পারেনই নি, উল্টে লালনীয় বিশ্লেষণকে শরীয়তের পক্ষে টেনেছেন জোর করে। বাউলকে যিনি বাতুল বা পাগল ভাবেন তাঁর পক্ষে শাস্ত্রীয় ধর্মসাধনার সমান্তরালে গোপনে স্রোতঃশীল মরমি লোকধর্মের বিপুল মানবিক প্রসার কি চোখে পড়তে পারে?

[ক্রমশ

উল্লেখপঞ্জী

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা, ১৩৯৮। পৃ ৫২৫।

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ৩য় খণ্ড। কলকাতা। ১৯৬৬। পৃষ্ঠা ১২০৬-১২১১।

৩. লালন শাহ: আবুল আহসান চৌধুরী। ঢাকা। ১৯৯০। পৃষ্ঠা ২০।

৪. লালন-বিজ্ঞাসা: এস. এম. লুৎফর রহমান। ঢাকা। ১৯৮৪। পৃষ্ঠা ১৫৭।

৫. দ্রষ্টব্য। ঐ। পৃষ্ঠা ২১০।

৬. দ্রষ্টব্য। ঐ। পৃষ্ঠা ১৬৩।
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রহমানের তেজি সমালোচনার ফলেই বোধহয় আবু তালিব তাঁর ১৯৬৮ সালের বক্তব্য সংশোধন করেছেন : ১৯৬ সালে। এবারে নতুন শিজরানামা থেকে আমানতউল্লার মুরীদ (শিষ্য) হিসাবে দেখানো হয়েছে শাহ আগোর মানিককে। তাঁর মুরীদ সিরাজ শাহ। তিনি লিখেছেন: সিরাজ শাহের পীর হিসাবে চট্টগ্রামের হযরত শাহ আমানতকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা গিয়েছিল, এখন সে ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।' দ্রষ্টব্য : 'লালন-চরিতের উপাদান : তথ্য ও সত্য' (আবু তালিব)—লালন সাহিত্য ও দর্শন : খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত। ঢাকা। ১৯৭৬। পৃষ্ঠা ৪২।

৭. লালন-জিজ্ঞাসা। পৃষ্ঠা ২০৯।

৮. লালন শাহ : আবুল আহমান চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১৯-২০

৯. বাউল মতবাদ ও ইসলাম। কুষ্টিয়া। ১৯৬৯। পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫।

১০. 'লালনের অচিন পাখী'। লালন মৃত্যুশতবর্ষ স্মারক পত্র। সম্পাদক : ওয়ালিউল বারী চৌধুরী। কুষ্টিয়া। ১৯৯০। পৃষ্ঠা ৭৯-৮১।

১১. 'বাংলাদেশে লালনচর্চা ও কয়েকটি জিজ্ঞাসা'। ঐ। পৃষ্ঠা ৪৬।

১২. 'হুকীবাদ ও লালন-গীতি'। লালন সাহিত্য ও দর্শন: খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত। পৃষ্ঠা ১৬১।

৬২৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মানচিত্রটি রামকৃষ্ণ দে-র আঁকা

পরিকল্পিত এক হত্যাকাণ্ডের মুহূর্তে

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকারের আড়ালে ওরা চারজন অপেক্ষায়……। মহিম, বিশু, রোহিত আর পরান। চারজনই সশস্ত্র। মহিমের প্যান্টের পকেটে গুলিভরতি রিভলভার। বিশুর কোমরের লুঙ্গিতে গোঁজা আছে একটা ধারালো ভোজালি। রোহিতের হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। আর পরানের হাতে ঝুলছে বাজারের ব্যাগ। সেই ব্যাগের ভেতরে সাবধানে রাখা আছে কয়েকটা তাজা বোমা।

আর কদিন পরেই বোধহয় অমাবস্যা। আকাশে চাঁদের সরু, মলিন ফালি চারপাশের থমথমে অন্ধকারকে যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। দু-হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা চেনা মানুষকেও অচেনা মনে হবে। হাইওয়ের ধারে বাসস্ট্যানড। তার পাশ দিয়ে ফুলকুসুমা গ্রামের দিকে চলে গেছে দীর্ঘ মোরাম-বিছানো রাস্তা। এই রাস্তা ধরে ছ-সাত মাইল হাঁটলে তবে ফুলকুসুমা গ্রাম। বাসস্ট্যানড থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই রাস্তার ওপরে একটা কালভার্ট। সেই কালভার্টের নীচে ওরা চারজন শিকারি বেড়ালের মতো ওত পেতে আছে।

ফুলকুসুমা গ্রামে পৌঁছবার যে একটিই রাস্তা, তা নয়। ক্যানেলের পাড় ধরে আরো একটা ঘুর-রাস্তাও আছে। সেই রাস্তা ধরে গ্রামে পৌঁছতে হলে দু-তিন মাইল বেশি হাঁটতে হবে। সন্ধের পর সাধারণত মানুষজন মোরামের এই রাস্তাটাকে এড়িয়ে চলে। ক্যানেলের পাড় দিয়েই বেশি হেঁটে কিংবা সাইকেল চালিয়ে বা মোপেডে নিজেদের বাড়ি পৌঁছায়। এর কারণ হল, কালভার্টের কাছে প্রায়ই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই হয়ে থাকে। ঝামেলা এড়াতেই লোকে বাসস্ট্যানড থেকে ক্যানেলের ঘুর-রাস্তা বেছে নেয়।

কিন্তু মহিম জানে—ঘুর-রাস্তা কোনোকালেই সুবিমলের পছন্দ নয়। সন্ধে হোক, আর গভীর রাতই হোক—সুবিমল এই নির্জন মোরাম-রাস্তা ধরেই হেঁটে আসবে তার গ্রামের দিকে—ফুলকুসুমায়।

বেশ কিছুদিন হল, সংগত কারণেই মহিমরা সুবিমলের গতিবিধির দিকে নজর রাখছে। গোপন খবর অনুযায়ী সুবিমল আজ সকালে গেছে জেলা-শহরে। সেখানে নাকি ডি. আই. অফিসে তার কী একটা কাজ আছে। অনুমানমতো, সুবিমলের ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। শিকার যাতে কোনোমতেই ফসকে না যায়, এজন্যে বাসস্ট্যানডে দুপুর থেকেই মহিমদের দলের এক-জনকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তার খবর হল—একের পর এক বাস এসে থেমেছে। নেমেছে অনেকে। সুবিমল এখনও নামে নি। সদর থেকে হিসেবমতো আর মাত্র একটা বাস আসার কথা। এই বাসটাতেই নিশ্চয়ই ফিরবে সুবিমল। বাস থেকে নেমে, জিতেনের গুমটি থেকে তার সাইকেলটা সংগ্রহ করবে। মহিম জানে—সুবিমলের ফোলিও ব্যাগে সবসময়েই একটা টর্চ থাকে। টর্চটা জ্বালিয়ে, সাইকেলের প্যাডেলে খুব ধীরে-ধীরে চাপ দিয়ে, যেন-বা গভীর কোনো চিন্তায় আচ্ছন্ন সুবিমল ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসবে এদিকেই। আসবেই···। একাই থাকবে সে। খবর একেবারে পাকা! এসব খবর মিথ্যে হয় না। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মহিমদের দলের এক উচ্চ-পর্যায়ের আলোচনাসভায় খুব গোপনে এক সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, সুবিমলকে খতম করে দেওয়া হবে। সুবিমলের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ যে দিকে এগোচ্ছে তাতে এখুনি তাকে না থামালে মহিমদের পার্টির সমূহ সর্বনাশ! আর মহিমরাও বুঝে গেছে যে, সুবিমলকে কোনোভাবেই নিবৃত্ত করা যাবে না। বরাবরই বড্ড একগুঁয়ে আর জেদি ও। নিজে যা ভালো বুঝবে করবে। মহিমদের পার্টি থেকে অনেক-বার তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ভয়ও দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুতেই লাভ হয় নি। শেষমেশ পার্টি বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে···।

ফশ করে দেশলাই জ্বালিয়ে বিশু একটা বিড়ি ধরাল। ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে আচমকা দেশলাই-কাঠির ঝলকানি চোখ ধাঁধিয়ে দিল সকলের। রোহিত চাপা গলায় বলল—'বিড়ির আগুন জ্বলছে আর নিভছে। দূর থেকে দেখে সন্দেহ হতে পারে। হাতের আড়াল দিয়ে খা—।' বিশু তাই করল। বিড়ির গন্ধ নাকে যেতে পরানেরও মনটা আনচান করে উঠল একটা বিড়ির জন্যে। কিন্তু তার ফতুয়ার পকেটে একটাও নেই। তাড়াহুড়োয় আর উত্তেজনায় সে নিজের বিড়ির কৌটোটাই ফেলে এসেছে ভুল করে। পকেটে শুধু খড়মড় করছে দেশলাইটা।

—'একটা বিড়ি দে, বিশু।' চাপা গলায় বলল পরান।

—'আর কেউ দেশলাই জ্বালবে না।' মহিম বলল।

—'ঠিক আছে, ওস্তাদ। বিড়ির আগুনেই ধরিয়ে নেব।'

ক্রমশ ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। সুবিমল আজ ফিরবে তো? ভাবে মহিম। অবশ্য লাস্ট বাসটা এখনও আসে নি। চারিদিক শুনশান বলে একটু দূরে হলেও বাসের আওয়াজ ঠিকই কানে আসবে। কয়েকটা ট্রাক আর জীপ গেছে। কিন্তু বাস এখনও আসে নি। মহিম দেখেছে তার নিজের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। গাড়ির চাকার আওয়াজ শুনে সে বলে দিতে পারে কী ধরনের গাড়ি। সে নিশ্চিত যে বাসটা এখনও এসে পৌঁছায় নি। এই শেষ বাসটা এমনিতেই একটু দেরি করে। তারপর কতো কী ঝামেলা হতে পারে। হয়তো মাঝরাস্তায় টায়ারই পাংচার হয়ে গেল। এরকম হয় না যে তাও নয়। কিন্তু অন্যরকমও তো হতে পারে। ভাবে মহিম। হয়তো সুবিমলের কাজ সারতে-সারতে দেরি হয়ে গেছে। শেষ বাসটা ধরা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। তখন হয়তো সদরেই কোনো আত্মীয়ের বাড়ি রাতটা কাটিয়ে ভোরে ফিরবে। সেক্ষেত্রে মহিমদের পরিকল্পনা-মাফিক কাজটা করা যাবে না। কিন্তু সেরকম না-ঘটবার সম্ভাবনাই বেশি। গ্রামের বাড়িতে সত্তর বছরের প্রায়-অথর্ব মা আছে সুবিমলের। মা আর যুবতী এক বোন। এই দুজনকে নিয়ে তার সংসার। নিজে তো এখনও বিয়ে করল না। মা আর বোনকে একা বাড়িতে রেখে কোনোদিনই বাইরে রাত কাটাতে পারে না সুবিমল। ওর মা শুধু অথর্বই নয়। অসুস্থও। বেশ কিছুদিন আগের একটা ঘটনা মহিমের এখন মনে পড়ল।···সাইকেলে জোরে প্যাডেল করে মহিম স্কুলে যাচ্ছিল। উলটো দিক থেকে দেখল একটা ভ্যান-রিকশ আসছে। তার পেছনে সাইকেলে সুবিমল নিজে। আর-একটু কাছাকাছি এগিয়ে মহিম দেখতে পেল—ভ্যান-রিকশর উপরে খড়ের বিছানায় জড়োসড়ো করে শোয়ানো রয়েছে সুবিমলের মাকে। দেখে মনে হল—খুবই অসুস্থ। পায়ের কাছে বসে আছে একটা ছেলে। মহিম ঠিক চিনল না। হয়তো সুবিমলদেরই প্রতিবেশী কেউ হবে। ভ্যান-রিকশটার কাছে এসে মহিম ব্রেক কষায় রিকশচালকও থেমে গেল। তাড়াতাড়ি সাইকেল থেকে নেমে মহিম সুবিমলের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—'কী রে, মাসিমার কী হয়েছে?'

—'খুব পেটের অসুখ। কাল রাত থেকে শুধু বমি আর পায়খানা।'

—'তাই নাকি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?'

—'হেলথ-সেনটারে।' ছ-ফিটের কাছাকাছি লম্বা বলে সুবিমলকে সাইকেল থেকে নামতে হয় নি। সীটের ওপর বসে সে একটা পা মাটিতে রেখে সাইকেল থামিয়েছিল। মহিমের সঙ্গে আর কথা বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করে সে ভ্যান-রিকশকে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করেছিল। নিজেও প্যাডেলে চাপ দিয়েছিল। মহিমের মুহূর্তে একবার মনে হয়েছিল—সুবিমলের সঙ্গে তারও হেলথ-সেনটারে যাওয়া উচিত। গত দু-তিন বছর আগেও সে সুবিমলদের বাড়িতে রাত কাটিয়েছে। তার মায়ের হাতে ভাত খেয়েছে। সেসব একটা দিন ছিল। তখন মহিম আর সুবিমল দুজনেই পাগলের মতো পার্টির কাজে ব্যস্ত থাকত। বিশেষত নির্বাচনের সময়টায় তাদের ঠিকঠাক নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকত না। কিন্তু সেসব দিনের সঙ্গে আজকের অনেক তফাত। আজ সুবিমল আর মহিম—দুজনের রাস্তা এক নয়। তাই মুহূর্তের মধ্যেই আবেগটাকে সামলে নিয়েছিল মহিম। সুবিমলকে চলে যেতে দিয়েছিল। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে খোঁজখবর ঠিকই রেখেছিল। সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলেন সুবিমলের মা। কিন্তু যতদূর সে জানে—এখনও তিনি পুরোপুরি সুস্থও হন নি। অতএব এ কারণেই মহিমের নিশ্চিত থাকা উচিত যে, সুবিমল কোনোমতেই আজ বাড়ির বাইরে রাত কাটাবে না। ফিরতে তাকে হবেই। এই রাস্তা দিয়ে। নির্জনে। টর্চের ক্ষয়ে-যাওয়া ব্যাটারির আলোয় পথ দেখে। হয়তো আর খানিক পরেই সুবিমল নিজের অজান্তে এগিয়ে আসবে। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।·····

কাজটা কিভাবে হাসিল করা হবে এ ব্যাপারে,—যাকে বলে, একটা ব্লু-প্রিনটও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ওদের। বারবার নিজের মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে মহিম দেখেছে—পরিকল্পনাটা মোটামুটি নিখুঁত। কালভার্টের কাছাকাছি সুবিমল এগিয়ে এলেই রোহিত প্রথমে লাফ দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। সে কিছু বুঝে ওঠবার আগেই রোহিত তার মাথা লক্ষ্য করে চালাবে লাঠি। সাইকেল থেকে ছিটকে পড়বে সুবিমল। হয়তো তার চশমাটাও ছিটকে যাবে দূরে। আর সঙ্গে সঙ্গেই, একটুও কালক্ষেপ না করে মহিম তার বুক লক্ষ্য করে রিভলভারের ট্রিগার টিপবে। প্রয়োজন না হলে বিশুর ভোজালিটা কোনো কাজে লাগার কথা নয়। আর পরানের বোমাগুলোরও দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। আসলে অতিরিক্ত সতর্কতাজনিত কারণে পরানকে সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। বোমা বাঁধা এবং ছোঁড়ার ব্যাপারে পরান একেবারে সিদ্ধহস্ত। কাজটা যদি রাতের অন্ধকারে, নিঃশব্দে হাসিল করা যায়, তাহলে বোমা মেরে লোক জানান

দেওয়ার কি কোনো দরকার আছে? তবে এরকমও হতে পারে যে সুবিমল নিজের বিপদ আঁচ করে একা-একা ফিরল না। সঙ্গে দু-চারজনকে নিল। সেক্ষেত্রে পরানকে কাজে লাগবে। বোমা মেরে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে হবে। আচমকা বোমাবাজিতে সুবিমলের সঙ্গের লোকজন নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবে। আর সেই সুযোগে একা সুবিমলকেই টেনে নিয়ে আসতে হবে কালভার্টের দিকে। কারণ তাকেই প্রয়োজন। অন্য কারুকে নয়। কাজটা এমনভাবে শেষ করতে হবে যাতে সুবিমল ছাড়া অন্য কারোর গায়ে হাত না পড়ে। ফালতু ঝামেলা বাড়ানো যেন না হয়। পার্টির নির্দেশ সেরকমই।···

আক্রান্ত হয়ে কি ভয় পাবে সুবিমল? ভয়ে কি পা জড়িয়ে ধরবে তার ঘাতকদের? 'ওগো আমায় মেরো না···আমার বাড়িতে মা-বোন আছে!'···এই বলে কি সে কেঁদে উঠবে ভেউভেউ করে? দৃশ্যটা একবারমাত্র কল্পনা করতেই মহিমের মুখে, অন্ধকারে, একটা বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন কেউই সেই হাসি দেখতে পায় না। ···অসম্ভব। সুবিমলকে দীর্ঘদিন ধরে যেটুকু জেনেছে মহিম তাতে এরকম হওয়ার কথা নয়। আলটপকা আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে যাবেই সুবিমল। কিন্তু ভয় পাবার ছেলে সে নয়। ভয়-ডর বলে কোনোকালেই তার কিছু ছিল না। হয়তো আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে সুবিমল। মহিম এখনও নিশ্চিত বলতে পারে না ঠিক কী ঘটবে। বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা তার আজও স্পষ্ট মনে আছে। আজ আবার সেই ঘটনাটা সে ভাবতে চেষ্টা করল। কতদিন আগেকার ঘটনা হবে? বোধহয় বারো বছর··· । তখন তারা দুজনেই খুব বন্ধু ছিল। গ্রাম থেকে পড়াশোনা করতে গেছে কলকাতায়। একই কলেজে ভরতি হয়েছে। একই হোস্টেলে থাকে। একদিন বেশ রাত করে সিনেমা দেখে ফিরছিল। রাস্তা শর্টকাট করার জন্যে একটা সরু গলির মধ্যে দিয়ে আসছিল। শীতকাল। তাই গলির দুধারে বাড়িগুলোর জানলা বন্ধ। নির্জন গলি। শুধু একটা পানের দোকান খোলা। আলো জ্বলছে। আর দোকানের সামনে চারজন ছেলে নিজেদের মধ্যে মশকরা করছে। পানজর্দার পকেটে হাত ঢুকিয়ে সুবিমল বলেছিল যে তার কাছে সিগারেট নেই। কিনতে হবে। পানের দোকানে এসে সে সিগারেট কিনছিল। ঠিক সেই সময় চারজন যুবকের একজন চাপা গলায় বলল—'গুরু, একটা মাল আসছে!' বাকিরা ঘুরে দেখল। ওদিক থেকে এক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা আসছিলেন। পথের আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তাতে বোঝা গিয়েছিল যে ভদ্রমহিলা বিবাহিতা। সম্ভবত ভদ্রলোকের স্ত্রী। এবং বেশ সুন্দরী। ওঁরা দুজন পানের দোকানের কাছাকাছি এগিয়ে এলে চারজন হঠাৎ রাস্তা ঘিরে দাঁড়াল! একজন এগিয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলার সামনে বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করে বলল—'আমার সঙ্গে আসবে?'

—'এ কি অসভ্যতা?' ভয়ার্ত গলায় ভদ্রমহিলা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। নিরীহ ভদ্রলোক একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছেন। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। অসহায়ভাবে একবার মহিমদের দিকে তাকালেন। ততক্ষণে ওরা ভদ্রমহিলার হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে! মহিম কিছু বুঝে উঠবার আগেই সুবিমল তীরের গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল! তারপর এলোপাথাড়ি চালাতে লাগল ছেলেগুলোর ওপর ঘুঁসি, কিল, চড়, লাথি!···এরকমভাবে যে কেউ তাদের মারতে শুরু করে দেবে ওটা বোধহয় ওদের ধারণার অতীত ছিল। অবাক চোখে মহিম দেখছিল সুবিমলকে। লম্বা, বলিষ্ঠ চেহারার সুবিমলের চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে! ওই চারজন ছেলেও, কী আশ্চর্য, সুবিমলের ওরকম মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল। একজনও ঘুরে দাঁড়িয়ে পালটা মার দেবার সাহস পেল না। আরও মার খাবার আগে চটপট কেটে পড়ল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভদ্রলোক আর ভদ্র-

মহিলার দিকে এগিয়ে এসে সুবিমল হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল—'এখন আর এমুখো হবে না শালারা! আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কোনো ভয় নেই। গলি থেকে বেরিয়ে আপনারা বড়ো রাস্তায় পড়লে আর কোনো অসুবিধে হবে না।' অস্ফুটে ভদ্রলোক সুবিমলকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

···মহিম জানে—নিজের এই প্রতিবাদী চরিত্র আজ পর্যন্ত বজায় রেখেছে সুবিমল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেও নিজেকে পালটায় নি সে। বস্তুত, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে, শুধুমাত্র ভীষণ এক আবেগের বশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বরাবর প্রতিবাদ করতে যেয়েই না সুবিমল আজ, এভাবে, তার বিপদকে নিজেই ডেকে এনেছে। কলেজের পড়া শেষ করে, দুজনেই গ্রামে ফিরে এসে, মাস্টারির চাকরি নিল। যদিও এক স্কুলে নয়। মাস্টারি করা ছাড়াও দুজনে আর-একটা ব্যাপারে একই সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। সেটা হল—রাজনীতি। রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে শামিল হওয়া ছাড়া, শুধুমাত্র খেয়ে-পরে, ব্যক্তিগত জীবনযাপন করা মানে, সমাজ থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা,—এরকম এক ধারণা—মহিম এবং সুবিমল দুজনের মনে গড়ে উঠেছিল অনেক আগে থেকেই। গ্রামে ফিরে আসার পর ওরা দুজনে প্রবলভাবে একই দলে রাজনীতি শুরু করে। অনেক গুণ আছে সুবিমলের। বিষয়কে বিশ্লেষণ করে-করে, খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় সে ভালো বক্তৃতা করতে পারে। এ ছাড়া সাংগঠনিক দক্ষতাও তার অসাধারণ। নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই পছন্দ করতেন সুবিমলকে। রাতের পর রাত জেগে, খাওয়া-ঘুম ভুলে, গ্রামে-গ্রামে গিয়ে সে মানুষকে সংগঠিত করতে ভালোবাসত। দলের নীচুতলার কর্মীদের কাছে তার ইমেজ ছিল অসাধারণ। বস্তুত, সুবিমলের খ্যাতি আর প্রতিপত্তি দেখে মহিমও তাকে, কবে থেকে যেন, গোপনে হিংসা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু তারপর কী যে মনে ঢুকল সুবিমলের। গত এক বছরে সে যেন বেশ কিছুটা বিগড়ে গেল। দলের কাজে আর যেন সে আনন্দ পেত না। বহুদিন পার্টি-অফিসে এসে—মহিম দেখেছে,—সুবিমল একা শূন্য-দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে আর একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করে চলেছে। এবং মাঝে-মাঝে দলের অনেক নীতির বিরুদ্ধে মহিমের কাছে গোপনে তার ক্ষোভ প্রকাশ করত সুবিমল। মাস ছয় পূর্বে একটা ঘটনা ঘটল। যার পর থেকে সুবিমলকে বেশ সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন নেতারা।

অনিল মণ্ডল—৭নং গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধান—টাকা-তছরুপের এক ঘটনায় বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়ে। উন্নয়নের টাকা সে ঠিকমতো খরচ করে নি—এরকম এক অভিযোগ পেয়ে প্রশাসনিক পর্যায়ে এক তদন্ত শুরু হয়। দেখা যায়—অফিসের ক্যাশবুক ঠিকমতো লেখা নেই। এবং পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যদের অনুমোদন ছাড়াই অনিল উপ-প্রধানের সঙ্গে ষড় করে উন্নয়নের বহু টাকা অন্যান্য খাতে খরচ করেছে। প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রধানের বিরুদ্ধে থানায় এফ. আই. আর. দাখিল করা হয়। গ্রেপ্তার হয় অনিল। জামিনে ছাড়া পেয়ে সে দলের আঞ্চলিক নেতা প্রভাসদার পায়ে কেঁদে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। —'আমাকে বাঁচান, প্রভাসদা। সব অভিযোগ মিথ্যে। অফিসের ক্যাশবুক লেখার দায়িত্ব আমার নয়। আমার শুধু সই করার কথা। আসলে পঞ্চায়েত-সেক্রেটারিই ক্যাশবুক না লিখে, অফিসের কাগজপত্র ইচ্ছে করে হারিয়ে, এলোমেলো করে আমাকে বিপদে ফেলেছে। আপনারা জানেন—গ্রাম-পঞ্চায়েত সেক্রেটারি অবিনাশ বিরোধী-পক্ষের লোক।···' প্রভাসদা অনিলের সব কথা শুনে এরকম এক ধারণায় আসেন যে—অনিল সত্যিই কোনো গভীর চক্রান্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। দলের পক্ষ থেকে তাকে বাঁচানো প্রয়োজন। আর তা ছাড়া অনিল দলের একনিষ্ঠ কর্মী। তার কাজকর্মে খুশি

হয়েই না পাঁচটা গ্রামসভার মানুষ একত্র হয়ে অনিলকে তাদের অঞ্চলের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেছে। প্রভাসদা জরুরি এক মিটিং ডাকেন। সেই মিটিং-এ ঠিক হয় যে, দলের পক্ষ থেকে অনিলকে সাহায্য করা হবে। প্রশাসন যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অনিলকে গ্রেপ্তার করেছে এবং এভাবে তার সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করেছে—এই মর্মে অনিল দলের সমর্থনে, উচ্চ-আদালতে একটি মামলা দায়ের করবে। সভায় উপস্থিত সবাই এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল। হঠাৎ কী হল? সুবিমল সকলকে অবাক করে উঠে দাঁড়িয়ে জানাল যে সে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছে। কেননা, তার কাছে খবর এবং প্রমাণ আছে যে, গত একবছর অনিল প্রধান হিসাবে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে নি। কু-সঙ্গে পড়ে গিয়েছে সে। বেশ কিছুদিন ধরে নাকি সুবিমল অনিলকে কয়েক জনের সঙ্গে, রাতের অন্ধকারে, গ্রামের ভাটিখানায় ঢুকতে দেখেছে। আর তা ছাড়া অনিলের পঞ্চায়েত থেকে কাটানো কয়েকটা পুকুরেরও কাজ সে নিজে গিয়ে দেখেছে। তার মতে—কাজ মোটেই ভালো হয় নি। অতএব অনিলের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার আগে দলের উচিত তার কাজকর্ম ভালো-ভাবে তদন্ত করে দেখা।

—'আর তা যদি না করা হয়,—' সুবিমল চেঁচিয়ে বলেছিল,—'যদি অনিলের অন্যায় কাজকর্মকে আমরা এভাবে মদত দিতে যাই, তাহলে, প্রভাসদা, আমি মনে করি,—আমাদের দলের ওপর সাধারণ মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হবে···।' সুবিমলের এরকম এক অপ্রত্যাশিত এবং বিতর্কিত বক্তব্যের পর সভায় রীতিমতো হইচই শুরু হয়ে যায়। প্রভাসদাকেও বেশ উত্তেজিত মনে হল। সকলকে থামিয়ে রাগত স্বরে বললেন প্রভাসদা—'সুবিমল, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। প্রকাশ্য সভায় এরকম ড্যামনিং বক্তব্য রেখে তুমি কিন্তু দলের কোড অব কনডাকট ভঙ্গ করছ। তোমার কিছু জানাবার থাকলে তুমি প্রথমে আমাদের লিখিতভাবে জানাতে পারতে। আমাদের মধ্যে এসব নিয়ে আলোচনা করবার অবকাশ থাকত। কিন্তু এভাবে নিয়ম ভেঙে তুমি আমাদের তরুণ কর্মীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছ। ···আর তাছাড়া আমরা বেশ কিছুদিন থেকেই তোমার কার্যকলাপের ওপর নজর রাখছি। আমাদের ধারণা তুমি প্রায়ই পার্টি-বিরুদ্ধ বক্তব্য রাখছ।···'

সুবিমল গলা আরো চড়িয়ে বলল—'এটা আপনাদের ধারণা হতে পারে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরকম। আমি বহুদিন থেকে দলে আছি। প্রাণপণে খেটেছি দলের জন্যে। আজও প্রয়োজন হলে খাটব। আমি দলের ভালো চাই। আর তা চাই বলেই ইদানীং দলের কিছু-কিছু সিদ্ধান্ত এবং কার্যকলাপ মেনে নিতে পারছি না। এর আগে কয়েকটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখিতভাবে জানিয়েছি। কিন্তু কোনো উত্তর পাই নি। আপনি সেসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করার প্রয়োজন মনে করেন নি। সব দেখেশুনে আমার মনে হচ্ছে···পার্টি তার নিজের আদর্শ থেকে অনেক ব্যাপারেই সরে আসছে। সবকিছু আমাদের আবার পর্যালোচনা করা দরকার। আর আবার বলছি—অনিলের মতো লোককে প্রশ্রয় দিলে জনসাধারণের কাছে আমাদের ইমেজ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।···

এসব কথা শুনে প্রভাসদা এত রেগে গেলেন যে, মিটিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা করে দিলেন। কয়েকজন সুবিমলকে তেড়ে মারতে এল। মহিম এবং অন্যান্যরা বহু কষ্টে তাদের থামাল। ব্যাপারটা কিন্তু বেশ গুরুতর দিকে মোড় নিল। দলের অন্যান্য নেতাদের কাছে প্রভাসদা ব্যাপারটা রিপোর্ট করলেন। এবং এর কয়েক মাস পরেই সুবিমল উঁচু মহল থেকে শো-কজ চিঠি পেল। তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ। এর কড়া উত্তর পাঠাল সুবিমল। এসবের পরিণামে সে অনিবার্য-ভাবে দল থেকে বহিষ্কৃত হল। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে

মহিমরা লক্ষ করল যে, সুবিমল সত্যিই দমে যাবার মতো মানুষ নয়। দলে কয়েকজন তার অনুগত ছিলই। তাদের জড়ো করে সে ঘন-ঘন নিজের বাড়িতে গোপন মিটিং শুরু করে দিল। প্রায়ই সন্ধের পর গ্রামে-গ্রামে গিয়ে কিছু-কিছু মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা শুরু করে দিল যে দল কোথায়-কোথায় ভুল রাস্তায় যাচ্ছে। ধান্দাবাজ এবং স্বার্থান্ধ লোকে দল ভরে উঠছে। কিভাবে দলের নেতারা ক্রমশ হয়ে উঠছে সুবিধাবাদী। কিন্তু সব সময়েই যে সুবিমল তার বক্তৃতার জন্যে যথেষ্ট শ্রোতা পেত, তা নয়। কিন্তু তবুও চেষ্টার তার ত্রুটি নেই। সে যেন সত্যিই নিজের জীবনকে বাজি রেখে এক সর্বনাশা খেলায় মেতেছে। কয়েকবার রাতের দিকে মহিমের বাড়িতেও এসেছিল সুবিমল। মহিমকে অনেক কিছু বোঝাবার চেষ্টা করত। একদিন মহিম রেগেমেগে বলেই দিয়েছিল—'তুই আর আমার কাছে আসিস না, সুবিমল। আমাদের রাস্তা এখন এক নয়। শুধুমাত্র পরিচিতি ছাড়া তোর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই।' সেইদিনই, যেন তার জীবনে প্রথম, সুবিমলের চোখে হতাশার একটা ছায়া দেখতে পেয়েছিল যেন মহিম।

হপ্তা ছুয়েক আগে এক সন্ধেবেলা হঠাৎ প্রভাসদা মহিমকে তাঁর নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। খুব জরুরি তলব। তাড়াতাড়ি সে পৌঁছে দেখল যে শুধু তাকেই ডাকেন নি প্রভাসদা। আরো তিনজনকে ডেকেছেন। বিশু, রোহিত আর পরান। প্রভাসদা তাঁর নিজের বাড়ির দোতলায় একটি ঘরে চুপচাপ বসে ছিলেন। ঘরে একটিমাত্র জানলা, সেটিও বন্ধ। দরজা বন্ধ। ফলে মাথার ওপরে পাখা ঘুরলেও কিরকম অসহ্য গুমোট লাগছিল। কেউ কোনো কথা বলছে না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। প্রভাসদার কপাল চিন্তায় কুঁচকে আছে। তাঁর হাতে জ্বলছে সিগারেট। বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকার পর শেষ-হয়ে-আসা সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে একবার চারজনের দিকে তাকিয়ে নিলেন প্রভাসদা। তারপর গম্ভীর ভারী গলায় বলতে শুরু করলেন—'একটা বিশেষ কারণে আজ তোমাদের এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে।' নাটকীয়ভাবে আবার একটু থামলেন প্রভাসদা। তারপর ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন—'এরপর যে কথাগুলো বলব, তা অতি গোপন। আশা করি এর বেশি কিছু আর বুঝিয়ে বলতে হবে না তোমাদের।'

আবার একটু বিরতি। সিগারেটটা নিভে গিয়ে-ছিল। সেটা ধরিয়ে ঘন-ঘন কয়েকবার টান দিয়ে আবার শুরু করলেন প্রভাসদা—'তোমরা সবাই জান যে, সুবিমল আমাদের দলে আর নেই। খুবই ভালো কর্মী ছিল ও একসময়ে। দলকে সত্যিই ভালোবাসত। কিন্তু ইদানীং দলবিরোধী নানা কাজকর্মের জন্যেই ওকে আমরা বের করে দিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, সুবিমল আপনা থেকেই চুপচাপ হয়ে যাবে। কিংবা কোনো একদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার ফিরে আসতে চাইবে আমাদের কাছে। কিন্তু আমাদের সে আশা পূরণ হয় নি। দল থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর সুবিমল মরিয়া হয়ে উঠেছে। নানা জায়গায় যে আমাদের সম্বন্ধে, দলের সম্বন্ধে, আমাদের নেতাদের সম্বন্ধে নানা কুৎসা রটাতে শুরু করেছে। এসবের জন্যে আমাদের অনেক খেসারত দিতে হতে পারে। আর কয়েক মাস পরেই নির্বাচন। সুবিমল যদি এইভাবে গ্রামে-গ্রামে মানুষের কাছে আমাদের সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়ে যায়, এবং আমরা যদি এসবের কোনো প্রতিকারের কথা না ভাবি, তাহলে আগামী নির্বাচনে আমরা হাতেনাতে তার কুফল পাব বলেই আমার বিশ্বাস। জনতা একটা বিশাল পিণ্ডের মতো। জনতার কোনো চরিত্র নেই। বোঝানোর গুণে কোনো ভুল বিষয়ও যদি জনতার মনে একবার ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার ফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে। এইসব কথা ভেবেই আমরা ঠিক করেছি—সুবিমলকে আর এগোতে দেওয়া যাবে না। তাকে শাস্তি পেতে হবে। বরাবরই ভীষণ গোঁয়ার আর

একরোখা সুবিমল। কোনোভাবেই ওকে থামানো যাবে না। তাই দলের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত—সুবিমলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে! আর সে কাজের ভার পড়বে তোমাদের চারজনেরই ওপর।'

প্রভাসদা থামলেন। তাঁর শেষ কথাগুলো শুনে মহিম যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার একসময়ের প্রিয় বন্ধু সুবিমলকে হত্যা করবার ভার পড়ছে তার ওপর? এ অসম্ভব·····! এরপর প্রভাসদা ফিসফিস করে আরো অনেক কিছু বলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একটা কথাও কানে ঢুকছিল না মহিমের। সে শুধু চিৎকার করে, ঘর ফাটিয়ে কিছু একটা বলতে চাইছিল! বলতে চাইছিল যে—পারব না, আমি পারব না, প্রভাসদা···। সুবিমল আমার অনেক দিনের বন্ধু। ···ওর মা আর বোনের কাছে আমি কোনোদিনই আর মুখ দেখাতে পারব না। আর তা ছাড়া·····। ···তা ছাড়া, প্রভাসদা, আমরা বোধহয় সবাই মনে-মনে জানি যে, মানুষ হিসেবে সুবিমল একশ ভাগই খাঁটি। ওর মতো আদর্শবান বোধহয় আমরা কেউ নই। আর সেটাই বোধহয় ওর একমাত্র দোষ। অন্যায় দেখলে চুপ করে থাকতে পারে না সুবিমল। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে সে পারে না। যা আমি, আপনি খুব সহজেই পারি। নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, প্রভাসদা—আপনি কি নিজেও জানেন না—গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রধান অনিল মণ্ডল একেবারেই সৎ নয়? প্রধানের চেয়ারে বসার পর চরিত্রের সবরকম দোষ আয়ত্ত করেছে ও। দিনের পর দিন ছোটো-ছোটো লোভ থেকে আরো বড়ো-বড়ো লোভের দিকে এগিয়ে গেছে। আপনারা সবই জানেন। কিন্তু জেনেশুনেও অনিলকে মদত দিতে এগিয়ে আসেন। অনিল জানে আপনাদের মতো নেতাদের কিভাবে বশ করতে হয়। ···সুবিমল সেদিন যেসব কথা বলেছিল, তা আমরা সকলে জানি, একবর্ণও মিথ্যে নয়। কিন্তু কেউ সত্যি কথা বলুক, এটা আমরা চাই না। তাই নয় কি, প্রভাসদা? আমি পারব না, প্রভাসদা। আমাকে ক্ষমা করুন! এত বড়ো শাস্তি দেবেন না আমাকে··।

কিন্তু না। এসব কোনোকিছুই বলতে পারে নি, মহিম। ঘরের আলো-আঁধারিতে শুধু তার ঠোঁট নড়েছিল। কেউই তার মনের কথা শুনতে পায় নি। এবং খানিক পরেই সে প্রভাসদার ঘর থেকে প্রায় টলতে-টলতে বেরিয়ে এসেছিল।···

* * *

—'মহিমদা, একটা আলো এগিয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছ?' চাপা গলায় রোহিত বলে। স্মৃতির আচ্ছন্নতা থেকে যেন চমক খেয়ে উঠে আসে মহিম। দৃষ্টিকে প্রখর করে তাকিয়ে দেখে।···হ্যাঁ। ঠিকই তো! একটা সরু আলোর রেখা ক্রমশ এগিয়ে আসছে কালভার্টের দিকে। ধীরে ধীরে···এগিয়ে আসছে? তাহলে আসছে সুবিমল। সব অনিশ্চয়তার শেষ। সুবিমলই আসছে। একা। সাইকেলে। টর্চের আলোয় রাস্তা দেখতে-দেখতে। একটা এক্সপ্রেস ট্রেন যেন ঝড় তুলে, প্রচণ্ড গতিতে মহিমের বুকের মধ্যে দিয়ে ছুটে যায়।

—'সবাই রেডি হও!' চাপা গলায় বলে রোহিত। পরিকল্পনামতোই রোহিত প্রথমে রাস্তার মাঝখানে নেমে যায়। তারপর মুহূর্তের মধ্যে সুবিমল কিছু বুঝে ওঠবার আগেই তার সাইকেল লক্ষ্য করে চালায় লাঠি! ধপ করে একটা আওয়াজ হয়। বোধহয় সুবিমলের পিঠে বা বুকে লাঠিটা পড়েছে। অস্ফুটে একটা আর্তনাদ করে সুবিমল মাটিতে পড়ে যায়। সাইকেলটা হুড়মুড় করে একপাশে ছিটকে যায়। ঠং করে একটা আওয়াজ! টর্চটাও ছিটকে বোধহয় পাশের ঝোপের মধ্যে পড়ে। একেবারে সুবর্ণ সুযোগ! মহিম লাফ দিয়ে এগিয়ে যায় মাটিতে ধরাশায়ী সুবিমলের দিকে। পকেটের রিভলভার এখন তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু এ কী। হাত এত কাঁপছে কেন মহিমের? রিভলভার তো আর সে জীবনে আজ প্রথম ধরছে না! সুবিমলের চশমাটাও

ছিটকে পড়েছে দূরে কোথায়। সম্ভবত সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু এক ভীষণ বিপদের অনুমানে টলে-টলে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

—'কী হল? এত দেরি হচ্ছে কেন? চালাও গুলি!' পরানের গলা শুনেও মহিম আঙুলগুলো নাড়াতে পারে না। অবশ হয়ে গেছে আঙুলগুলো। কেন এমন হল? হাতের মধ্যে অস্ত্রটাকে যেন পাথরের মতো ভারী লাগছে! ডান হাতটা কি পঙ্গু হয়ে গেল? চকিতে ভাবে মহিম। আর ভাবতে-ভাবতেই সবিস্ময়ে লক্ষ করে—রিভলভারটা তার হাতের অবশ মুঠো থেকে খসে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে···!!

নভেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় দুটি মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে। পাঠকেরা অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন।

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	শুদ্ধপাঠ	ছাপা হয়েছে
৫৭৬	১	৩	রীতিনীতি	রাজনীতি
৫৭৮	২	১৫	বেধ	বোধ

আমার রবীন্দ্রনাথ-ভিক্তোরিয়া-বিষয়ক বইদুটির সূত্রে

কেতকী কুশারী ডাইসন

মাননীয়া গৌরী আইয়ুব "চতুরঙ্গ"-এ পর-পর দুটি সংখ্যায় আমার দুটি বইয়ের দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছেন। সংখ্যাদুটি পত্রিকার দপ্তর থেকে ডাক-যোগে আমাকে পাঠিয়ে সম্পাদক আমার ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন। আমার বাংলা বইটি প্রকাশের পর ছ' বছর ও ইংরেজী বইটি প্রকাশের পর তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও যে বইদুটি সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধায়তন সমালোচনার জন্য পত্রিকায় জায়গা করা হয়েছে, তা থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে বিষয়টাকে "চতুরঙ্গ"-এর সম্পাদক নেহাত তুচ্ছ মনে করেন না, এবং তিনি যে পত্রিকার ঐ সংখ্যাদুটি আমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন, এ থেকে অনুমান করি যে আমার দিক থেকে কিছু প্রতিক্রিয়া তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত হবে না। হ্যাঁ, আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আশা করি সম্পাদক আমাকে জায়গা দেবেন। আলোচনাপ্রবাহের ধারা-বাহিকতা রক্ষার্থে প্রথমে জুনের এবং তার পর জুলাইয়ের সংখ্যায় প্রকাশিত সমালোচনার সূত্র ধ'রে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

* * *

এ কথা সকলেই জানেন যে আমার বাংলা বইটির নির্মাণে যে-আঙ্গিকগত অভিনবত্ব বর্তমান তা পাঠক-মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমি চেয়েছিলাম গবেষণা আর কথাসাহিত্যের পারস্পরিক অভিঘাতের মাধ্যমে কতগুলো কথা বোঝাতে। ভেবেছিলাম যে দুটো পাথরের ঠোকাঠুকিতে পাঠকদের চোখের সামনে কিছু নতুন চেনার আলো জ্বলে উঠবে। অনেক পাঠকের বেলাতেই সে-উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমার সৌভাগ্যক্রমে বেশ কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তি এই আঙ্গিককে স্বাগত করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন: 'এ বইয়ে কেতকী যা দিতে চাইছেন, এই বিশেষ আঙ্গিক ছাড়া আর কোনো-ভাবেই তা দেওয়া যেতো না।' শ্রদ্ধেয় শিবনারায়ণ রায় বইটিকে চিহ্নিত করেছিলেন 'একটি অসামান্য

বই' ব'লে। জানি না গৌরী দেবী এঁদের কেবলই আমার 'মুগ্ধ পাঠক' মনে করবেন কিনা। তবে এ খবরও আমার অজানা নয় যে এই আঙ্গিক আরেক দল লোকের পছন্দ হয় নি। দেখা যাচ্ছে যে গৌরী দেবী এই দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। যে-বিরোধটা ঘটছে তা কেবল দুজন ব্যক্তির মধ্যে নয়, দু' ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। এ তো কোনো আদালতের মামলা নয়, যে দু' পক্ষে উকিল লাগিয়ে বাদ-প্রতিবাদ ক'রে এর কোনো চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। সাহিত্যের বিচার ওভাবে হয় না। সাহিত্যের মূল্যায়ন হয় একটা দীর্ঘ সময়ের পটে। সুধীজনের মতামত ধীরে-ধীরে সঞ্চিত হতে থাকে। যে-বই যত নতুন ধরনের হয়, যত পরীক্ষামূলক হয়, তাকে নিয়ে তত ঝড় ওঠে। কত বই প্রকাশকালে বিপুল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়, আবার কালক্রমে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করে। কত মর্যাদাবান বই সমসাময়িকদের দ্বারা অবহেলিত হয়, তার পর কোনো সহমর্মী উত্তরসূরির উদ্যোগে তা পুনরাবিষ্কৃত ও সমাদৃত হয়। আমি যাঁদের সাহিত্যিক বিচারকে মূল্য দিই সেরকম কিছু রসিকজনের বিশ্বাস এই যে আমার আলোচ্য বইটির মর্যাদা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ীই হবে। বর্তমান কালে কেবল ঐটুকুই বলা চলে—ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে একটা আস্থার উচ্চারণ।

কিন্তু কেন এই আস্থা? এই বিশ্বাসের কি কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে? তাকে কি বিশ্লেষণ করা যায়? হ্যাঁ, কিছু দূর হয়তো যায়, কেননা যে-দুই প্রতিভাসের বিরোধিতার ফলে তর্কের ঝড়টা উঠছে তাদের উভয়ের গাত্রে কিছু সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক চিহ্ন আছে। সংক্ষেপে সহজ ভাষায় বোঝাতে গেলে সূত্রাকারে বলা যায়: একটি দিক সেকেলে, অন্য দিক একেলে। এই দুই পক্ষের ধাক্কাধাক্কিতে একদিন না এক-দিন প্রথম পক্ষ পিছু হটতে বাধ্য। পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে থাকার প্রয়াস কালের দুর্বার স্রোতে কখনোই স্থায়ী হয় না, শেষ পর্যন্ত জয় হয় নতুনেরই। আমার ধারণা, আলোচ্য বইটার প্রতি এ মুহূর্তে কিছু 'সেকেলে' মানুষের যে বিরোধিতা তা ধোপে টি'কবে না। গৌরী দেবী তাঁর প্রবন্ধে নিজেকে 'সেকেলে' ব'লে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিতই করেছেন। অথচ বইটার জন্য সরাসরি অকুণ্ঠ প্রশংসা আমি আজও পাচ্ছি। তার প্রাণশক্তি যে ফুরিয়ে গেছে তা তো মনে হয় না।

মাত্র কিছুদিন আগে এমন একজনের টেলিফোন পেলাম, যাঁকে সাতাশ-আটাশ বছর চোখে দেখি নি, মধ্যে একবার টেলিফোনেই কথা হয়েছে কেবল। অবসরপ্রাপ্ত মানুষটি বর্তমানে থাকেন লণ্ডনের কাছে, কিন্তু এককালে কলকাতায় আমার কিশোরী-বয়সে তাঁর কাছে সংগীতে কিছু তালিম নিয়েছিলাম। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি আমাকে বললেন: 'তুমি এরকম একটা বই লিখেছো, আর আমাকে জানাও নি। একদিন আমাদের এখানে এসো, একটা গান-বাজনার আসর করবো। আমার যন্ত্রটা বার করবো, সারা দিন সারা রাত ধ'রে চলবে সেই আসর। আমরা সেই গানটা বাজাবো—'মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে···' ইত্যাদি কত কথা। হয়তো গৌরী দেবী বলবেন, ইনি নেহাতই আমার একজন 'মুগ্ধ পাঠক', কিন্তু সেদিন সত্যি মনে হয়েছিলো, বইটা লেখা অসার্থক হয় নি। সম্পর্কে ইনি আমার গুরুস্থানীয়; অবসর যখন গ্রহণ করেছেন তখন প্রবীণদের কোঠাতেই ফেলতে হবে এঁকে। এঁর সাহিত্যিক মতামতকে প্রভাবিত করার জন্য আমি কোনো দিন কোনো চেষ্টাই করি নি। সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই এঁর প্রশংসা সহসা একদিন আমার টেলি-ফোনের তারে বেজে উঠেছে, সংগীতের ঝংকারেরই মতো। সহমর্মিতার এই মুহূর্তগুলোই শিল্পীদের জীবনের আসল পুরস্কার। রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ইনি নন, কেবল সংবেদনে আমার সহশিল্পী, এবং রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিকে কোনো কল্পিত ভাইরাসের ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তেমন কোনো দায় এই দেশান্তরিত সংগীতপাগল বাঙালী মুসলমান মানুষটির নেই। 'ভাই

রে, কলকাতা ঢাকা কোথাও আমার আজ ঘর নেই রে।' হয়তো তাই রবীন্দ্রখ্যাতি বিপন্ন হতে চলেছে তেমন ধরনের কোনো প্যারানইয়াও নেই।

গবেষক আর কথাসাহিত্যিকের 'জাত আলাদা', গৌরী দেবীর এই দাবি কেবলমাত্র একটা আংশিক সত্য, কখনো পুরোপুরি সত্য হতে পারে না। নয়তো কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে একই সঙ্গে গবেষক এবং কথাসাহিত্যিক হয়ে ওঠা সম্ভবই হতো না। কিন্তু মানুষ যে তা হয়। সৃষ্টি আর গবেষণা ছুটো জল-অচল কামরা নয়। একই ব্যক্তির মধ্যে যদি ছুটো প্রবণতাই বর্তমান থাকে, তা হলে সে ছুটোকে একই বইয়ের শরীরে চারিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য বইটির মুখবন্ধে পরিষ্কার করেই বলেছি। অপিচ বলবো, কি শিল্পসাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে, কি ইতিহাসের মতো মানবিক বিদ্যায়, উচ্চস্তরের গবেষণা কখনোই নিছক তথ্যসন্ধানের ব্যাপার নয়। তারজন্য সৃজনশীল কল্পনাশক্তি লাগে। একটা অনুসন্ধিৎসার বশবর্তী হয়ে তথ্য খুঁজতে বেরোনো, খুঁজতে খুঁজতে সূত্র ধ'রে একটা পথ থেকে আরেকটা পথে চলে যাওয়া আপাত-অসংলগ্ন তথ্যদের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার ক'রে তাদের সাজানো : এই ধরনের কাজ করতে গেলে সত্যিই সৃষ্টিশীল মন লাগে। তাই ভালো গবেষণা আর শিল্পসৃষ্টি এ ছুয়ের মধ্যে সেরকম কোনো মেরু-বৈপরীত্য নেই। বৈপরীত্যটা বোধ হয় কল্পনা করেন তাঁরাই, যাঁরা নিজেরা কখনো ছুটো কাজ করেন নি, কেবল একটাকে নিয়ে থেকেছেন। যাঁরা নিজেরা ছুটো কাজই করেছেন তাঁরা ভিতর থেকে জানেন যে আসলে সেরকম কোনো বৈপরীত্য নেই। এ ব্যাপারে সব্যসাচীদের সাক্ষ্যই নিশ্চয় প্রামাণিক ব'লে গণ্য হবে।

আরও বলবো, একজন সৃজনশীল শিল্পীর অন্তর্জীবনকে বুঝতে সৃজনশীল শিল্পীর মন লাগে। একজন শিল্পীর জীবনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিভাবে কবিতায় উপন্যাসে গানে ছবিতে রূপান্তরিত হয় তা যাঁরা নিজেরা সৃষ্টির কাজ করেন তাঁরা ভিতর থেকে জানেন। রূপান্তরের প্রক্রিয়াটার সঙ্গে তাঁরা অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত। তাই তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিকে ফেলনা বলা চলে না। এই বোঝার কাজ কোনো শুকনো ব্যাপার নয়, এর মধ্যে জীবনে জীবন যোগ করার ব্যাপার আছে। এটা বোঝানোর জন্যও আমি মিশ্র আঙ্গিক অবলম্বন করেছিলাম। রবীন্দ্রজীবনে ওকাম্পোর ভূমিকাকে নিয়ে আমার আগে যিনি মাথা ঘামিয়েছিলেন সেই মানুষটিও কবি।

বিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন 'আন্তর্বিদ্য' চর্চা থেকে নূতন দৃষ্টিকোণ লাভ হয়, শিল্পকলার ক্ষেত্রেও তেমনি মিশ্র আঙ্গিক থেকে লাভ হয়ে থাকে। গানের মধ্যে কবিতা আছে, সংগীতও আছে। অপেরা, ব্যালে, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য—সবই মিশ্র জ'ার। উপন্যাসের ভূমিকা এককালে কাব্যেরই অন্তর্গত ছিলো। ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে হলে একজন মানুষকে ঔপন্যাসিকও হতে হবে, ইতিহাস নিয়ে অনেক পড়াশোনাও করতে হবে। মহাভারতে ইতিহাস কাব্য আখ্যান পুরাণ ধর্মোপদেশ নীতিকথা—কী না নেই? ভারতবর্ষের ঐ মহাগ্রন্থটি কি মিশ্রতার এক চূড়ান্ত প্রতিভূ নয়? তার মধ্যে তো ধর্ম আছে, জিরাফও আছে।

মিশ্রতা কোনো কলঙ্ক তো নয়ই, বরং শক্তির উৎস। জীবনের নানা ক্ষেত্রেই মিশ্রতাকে নিয়ে যে-আপত্তি, তা জাতি-শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের ও রক্ষণশীল মানসের আপত্তি। তাঁতী তাঁতীই থাকবে, কুমোর কুমোরই থাকবে, 'মেয়েছেলে' 'মেয়েছেলে'-ই থাকবে : এরা কেউ অন্য কোনো-কিছু হয়ে উঠতে পারবে না। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পশ্চাতে টানে। অথচ বলা চলে যে বস্তুত মিশ্রতাই ভারতীয় সভ্যতার সব থেকে বড় শক্তি। সেখানে যে আর্য-অনার্য দ্রাবিড়-চীন শকহূন দল পাঠান-মোগল এক দেহে লীন হয়েছে, সেই বহুবাচনিকতাই তার সব থেকে বড় জোর, তার উর্বরতার ও ঋদ্ধির উৎস। অ্যাংলোস্যাক্সনের শক্ত বনিয়াদের উপরে ফরাসী আর লাতিন শব্দসম্ভারের সৌধকে জুড়ে দিতে পেরেছে ব'লেই ইংরেজী ভাষা বিশেষভাবে জোরদার হয়ে উঠেছে। ভাষার ও ভাবের সংকরতা যে-যুগে দুর্দান্ত প্রশ্রয় পেয়েছে সেই যুগেই শেক্সপীয়রের নাট্যপ্রতিভা বিকশিত হতে পেরেছে। সেই সাহসী নাট্যকার তাঁদের নাট্যরীতির ধ্রুপদী নিয়মকানুন দু' হাতে ভেঙেছেন। নিয়ম ভেঙেই তিনি বড় হয়েছেন। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এসব কথা অতিপরিচিত, প্রায় 'ক্লিশে'। 'হাইব্রিডিজ্‌ম্‌' যে একটা মস্ত শক্তি, এই তত্ত্বটি আমি কত কাল আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে এবং পঞ্চাশের দশকের কলকাতার সাহিত্যিক আবহাওয়ায় আয়ত্ত করেছি। তার পর থেকে অবস্থাগতিকে সেই তত্ত্বে আস্থা আমার মধ্যে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। মিশ্রতার প্রতি পক্ষপাত আমার মজ্জায় মিশেছে : আজকের শুদ্ধিবাদীরা কড়া সমালোচনা ক'রেও আমার লেখা থেকে সে-বৈশিষ্ট্যকে উচ্ছিন্ন করতে পারবেন ব'লে মনে হয় না। বঙ্গের নবজাগরণের স্বরূপকে নিয়ে যত তর্কই চলুক না কেন, সেই আলোড়ন যে পুব আর পশ্চিমের উত্তাল মিশ্রণের জাতক, তা অস্বীকার করা যায় না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই মিশ্রণের রাজকীয় অপত্য। তাঁকে 'ডি-কন্‌স্ট্রাক্‌ট্‌' ক'রে কোনো অবিমিশ্র সংস্কৃতির সন্তান ব'লে প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়।

আমার আলোচ্য বইয়ে ছোট ছোট নানান নকশায়, নানা সংলাপে, নানা হাস্যপরিহাসের মাধ্যমে হাইব্রিডিজ্‌মের জয়গান গাওয়া হয়েছে। স্বয়ং ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পো যে একধরনের হাইব্রিড ছিলেন, তা-ও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বইটা এক অর্থে মিশ্রতার উৎসব। একজন বাঙালী, একজন ইংরেজ, আর একজন আর্জেন্টাইনের ত্রিকোণ আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বকে বুঝে উঠতে হলে হাইব্রিডিজ্‌মের সমঝদার হয়ে উঠতে হবে। পয়েন্টটা আপনাদের হয়তো এভাবে বোঝানো যায় : শুদ্ধিবাদীরা যতই চটুন না কেন, অনামিকাকে যে কল্পনা করতে পেরেছে, হয়তো কেবল সে-ই ঐ ত্রিকোণ বন্ধুত্বকে নিয়ে গবেষণা করতে পারতো। যাঁরা বইটার উপন্যাস-অংশের সমালোচনা করেন, তাঁরাও স্বীকার করেন যে বইটার মধ্যে কিছু মূল্যবান গবেষণা আছে। তাঁদের কি একবারও মাথায় আসে না যে ঐ দুই ধরনের কৃতির মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে? স্প্যানিশ তেমন কিছু কঠিন ভাষা নয়। ইন্দো-ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীরই ভাষা। ইংরেজী-ফরাসী বা সংস্কৃত যাঁদের জানা আছে তাঁদের পক্ষে তেমন দুষ্কর নয় স্প্যানিশটাও একটু-আধটু শিখে নেওয়া। কেন আপনারা কেউ শিখে নিলেন না? আমি তো স্কুলে বা কলেজে স্প্যানিশ পড়ি নি : যেটুকু শিখেছি নিজের চেষ্টাতেই শিখেছি। আপনারাও সেভাবেই শিখে নিতে পারতেন। তার পর, ডার্টিংটন হল প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ। এল্‌ম্‌হার্স্ট আর্কাইভ্‌সের কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সহযোগী। যেসব খবর আমি আমার বইয়ে দিয়েছি সেসব আমার আগে আর কেউ রিসার্চ ক'রে বার করতে পারলেন না কেন? তার কারণ কি এটা হতে পারে না—যে ঐ জাতের অনুসন্ধান করতে যে-ধরনের মন লাগে তা তাঁদের ছিলো না? যে-মন অনামিকাকে কল্পনা করতে পেরেছে সেই মনই রিসার্চগুলোও করতে পেরেছে। বইটার মিশ্র আঙ্গিকের সেটাই প্রকৃত ভিত্তি।

মনে পড়ছে, বহুকাল আগে একবার কলকাতার দূরদর্শনে মিশ্র বিবাহের উপরে একটি আলোচনা-অনুষ্ঠানে গৌরী দেবী আর আমি দুজনেই অংশ নিয়েছিলাম। আমার মতো তিনিও কি নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকেই জানেন না যে শুদ্ধির জন্য জাত-বাঁচানো ত্বক্-বাঁচানো আকুলতা কখনো কখনো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়তে পারে, আর মিশ্রতাকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত থাকতে পারে প্রাণশক্তি? আমার আঙ্গিকের মিশ্রতা নিশ্চয়ই

আমার ভিতর থেকে হয়ে ওঠা, আমার অন্তরতম সৃষ্টিশীল সত্তা থেকেই নিঃসৃত। গৌরী দেবী যদি একে 'psychic kaleidoscope' বলতে চান, তাতে আমার আপত্তি নেই। সেটাকে কমপ্লিমেন্ট হিসাবেই নেবো। নিছক শিল্পগত বিচারে হয়তো এ ব্যাপারে আমার উপরে দুটি প্রভাব সক্রিয়: একটি পাশ্চাত্য সংগীতের, অন্যটি আধুনিক সিনেমার। এবং এই দ্বিবিধ প্রভাব এই বইয়েই প্রথম পড়ে নি, আমার প্রথম উপন্যাসেও পড়েছে মনে হয়। আমার সমালোচকরা সাধারণত ভুলে যান যে আমার প্রথম উপন্যাসও খুবই পরীক্ষামূলক, আঙ্গিকে তথা বিষয়ে যথেষ্ট নতুন ধরনের। আসলে, যাঁরা আমার দ্বিতীয় উপন্যাসের বিরূপ সমালোচনা করেন তাঁদের কারোই আমার সাহিত্যিক বিবর্তনকে বোঝার কোনো তাগিদ নেই, তাঁরা কেবল রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে আগ্রহী। রবীন্দ্র-কৌতূহলের সূত্রেই তাঁরা আমার বইটার দিকে এগিয়ে এসেছেন। এঁদের কাছে আমার বইয়ের আঙ্গিকগত পরীক্ষার কোনো মূল্য নেই, কোনো আবেদন নেই।

এখানে দু'-একটি বাড়তি খবর অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৮১ সালে শ্রদ্ধেয় বিরাম মুখোপাধ্যায় আমাকে রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্তোরিয়ার উপরেই একটি ছোট বই লিখতে বলেছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার ভিতরে একটা উপন্যাসই রূপ নিচ্ছিলো। বিলেতে ফিরে এসে অনুসন্ধানগুলো করেছি, কিন্তু তথ্যগুলোকে সাজানোর কোনো পদ্ধতি আমার মনঃপূত হয় নি, এদিকে উপন্যাসটা উত্তরোত্তর দাবিদার হয়ে উঠেছে। এক বিনিদ্র রাত্রে হঠাৎ ক'রেই বুঝতে পারলাম, সাংগীতিক অথবা সিনেমাটিক কায়দায় উপন্যাসটার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যগুলো কিভাবে সাজানো যায়। আমার মন ব'লে উঠলো, ইউরেকা। সেই থেকে দুটো জিনিস পরস্পরে প্রবিষ্ট হলো, তাদের গ্রন্থন আর ছাড়ানো গেলো না। তখন দুটো ধারায় মিলে-মিশে বইটা তার বর্তমান রূপে আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো। অধীক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে যা-কিছু এসেছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা বা আমার কাদম্বরী-চিন্তা, তাদের সাজাতে কোনো অসুবিধা হয় নি। নিয়ম-না-মানা বইটাকে যখন বিরামবাবুর কাছে পাঠালাম, তখন তিনি গৌরী দেবীর মতো তাকে 'সিংহরিণ' বা 'শ্যামদেশীয় যমজ' ব'লে উপহাস করেন নি বা খারিজ ক'রে দেন নি। কিছুকাল একেবারে নীরব থাকার পর সাদরে তাকে স্বাগত করেছিলেন। যদিও লোকে একে কিভাবে নেবে সে-বিষয়ে তাঁর একটা উদ্‌বেগ ছিলো। আজ বুঝতে পারি, কী উদার ছিলো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তি-শিল্পীর উপরে আস্থা স্থাপন ক'রে নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষামূলক কাজকে যাঁরা পরিবেশন করতে দ্বিধা করেন না, তেমন ইম্প্রেসারিও-রাই শিল্পীদের যথার্থ বন্ধু। বাঙালীর সংস্কৃতি-জগতে এরকম দু'-একজনকে সর্বদা পেয়ে গেছি ব'লেই এ যাবৎ যা-কিছু করেছি তা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি, এবং আমার বিশ্বাস এঁদের সব সময়ই পাওয়া যাবে।

কিন্তু ১৯৮২ সালে বিরামবাবুর কাছে পাঠানো পাণ্ডুলিপিখানার নাম ছিলো 'ভিক্তোরিয়া। ভিক্তোরিয়া।' ঐ নামটা গৃহীত হলে অনামিকা আর ভিক্তোরিয়ার মধ্যবর্তী সরাসরি লাইনটা আধুনিক-ভাবে প্রতিষ্ঠা পেতো। আমার গল্পে অনামিকা তার জীবনের প্রথম সংকটকে কাটিয়ে উঠতে গিয়ে তার নবারব্ধ স্প্যানিশ-চর্চাকে অবলম্বন করেছে এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের বিজয়াকে বুঝতে বাঙালী কৌতূহলে এগিয়ে গেছে। তার পর তার জীবনের দ্বিতীয় সংকট কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে সে প্রেরণা পেয়েছে ভিক্তোরিয়ার ফেমিনিস্ট দিকটার কাছ থেকে, যা তাকে ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়েছে রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক ভাবনা আর কাদম্বরী দেবীর দিকে। ভিক্তোরিয়ার প্রতি অনামিকার আর্ত আবাহনটা তাই এই বইয়ের যোগ্য নাম ব'লে মনে হয়েছিলো আমার। কিন্তু বিরামবাবু বললেন, বইয়ের টাইটেলে রবীন্দ্রনাথের নাম

রাখতেই হবে। তখন ভেবে তাঁকে বর্তমান নামটা বললাম। এটা তাঁর তৎক্ষণাৎ পছন্দ হলো। অবশ্য নাম যেমনই দেওয়া হোক না কেন, যাঁরা প্রধানত রবীন্দ্রমধুলোভী তাঁরা খবর পেয়ে এই বইয়ের দিকে আসতেনই। তাই ভুল বোঝাবুঝিগুলো কোনোভাবেই এড়ানো যেতো না।

কোনো লেখা লেখকের চরিত্রনিরপেক্ষ হয় না। মিশ্রতা আমার কাছে কোনো দোষাবহ ব্যাপার নয়,—জীবনে নয়, শিল্পেও নয়,—এই ছোট্ট তথ্যটুকু মনে রাখলে পাঠকদের পক্ষে আমাকে বোঝা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। আমার নিজের সন্তানরাই মিশ্র রক্তের, আগেকার দিনে 'সেকেলে' সাহেব-মেমেরা যাদের ব্যঙ্গ ক'রে বলতেন 'হাফ্‌-কাস্ট্‌'। হাফ্‌-কাস্ট্‌ তো কি? তাতে কি তাদের মনুষ্যত্বে কোনো খাদ মিশেছে? না, মেশে নি। তারা পূর্ণ মানুষ। তেমনি আমার এই হাফ্‌-কাস্ট্‌ বইও একটা বৈধ বই, কোনো 'সিংহরিণ' বা 'শ্যামদেশীয় যমজ' নয়। আমার ডক্টরেটের গবেষণাও ছিলো আন্তর্বিদ্য, সাহিত্যে ইতিহাসে মিলিয়ে। সেজন্যও আমাকে নানা ঝামেলায় পড়তে হয়েছে।

কিন্তু ব্যক্তিগত কথা এখানে মোটেও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমি তো সত্যিই একজন ইংরেজের ঘরনী-রূপে জীবনের অর্ধেক কাটিয়ে দিলাম; আমার জীবনটা তো সত্যিই পুবে পশ্চিমে বেণী-বাঁধা। আমার মনের ক্যামেরাটা দিয়ে তো সত্যিই অহরহ বৃহত্তর পৃথিবীটার আলোকচিত্রগ্রহণ চলেছে। আমি তো সত্যিই প্রাদেশিক বা একসাংস্কৃতিক মানুষ নই, আমি তো সত্যিই আন্তর্জাতিক মানুষ—যেজন্যে রবীন্দ্র-ভিক্তোরিয়া-এল্‌মহার্স্ট-র আন্তর্জাতিক কাহিনীটি বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আমি তো সত্যিই দুটো ভাষায় কবিতা পর্যন্ত লিখি—যেজন্যে সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদের কাজে আমন্ত্রিত হয়েছি, সে-কাজ করেছি, ক'রে আনন্দ পেয়েছি। যাঁরা উচ্চশিক্ষিত ও সূক্ষ্মদর্শী, অন্তত তাঁরাও তো আমার লেখা বিশ্লেষণ করার সময়ে এই নৃতাত্ত্বিক মাত্রাটি বিবেচনার মধ্যে নিতে পারেন। যারা নিজেরাই বিভিন্ন সংস্কৃতি ও দেশের মধ্যে সেতুস্বরূপ তাদের নানা কাজেই একটা মিশ্রতা, একটা সেতুবন্ধনপ্রবণতা ফুটে উঠতে পারে। নানা দেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং নানা দেশের চিন্তাভাবনা সাহিত্য গানবাজনা ছবি সিনেমা রান্নাবান্না ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমরা ক্রমশ সীমানা লঙ্ঘন করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। ষাটের দশক থেকেই আমার লেখায় এই লক্ষণ পরিস্ফুট। 'নারী, নগরী'-কে আমি বলি আত্ম-জীবনীমূলক স্কেচ, কিন্তু অনেকেই তাকে বলেছেন প্রায়োপন্যাস।

আমি চারণবৈচিত্র্যে প্রচণ্ডভাবে আস্থাশীল। তা থেকে চিত্তের সমৃদ্ধি হয়। রাঁধি ব'লে কি গবেষণা করতে পারি না? গবেষণা করতে পারি ব'লে কি কবিতা লিখতে পারি না? কবিতা লিখি ব'লে কি বিজ্ঞানে আগ্রহ নেই? 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকাটার পাতা উলটে থাকি, এবং এই পত্রিকায় কখনো-সখনো আমার চিঠি পর্যন্ত বেরিয়েছে। সম্প্রতি অক্সফোর্ডের মহিলা নৃতত্ত্ববিদ্‌দের একটি দল আমাকে ধ'রে বেঁধে তাঁদের সংস্থার সাম্মানিক সদস্য করেছেন। আমি তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে নিচ্ছি। তাঁরা যে আমার কাছ থেকে কী পাচ্ছেন তা তাঁরাই জানেন, তবে কিছু-একটা নিশ্চয় পাচ্ছেন, নয়তো আমাকে তাঁদের দলে টানতে সচেষ্ট হতেন না।

এবং এটাও উল্লেখ্য যে এই চারণবৈচিত্র্য কেবল আমার একলার নয়, আমার পরিবারের অন্য মানুষ-গুলির মধ্যেও তাকে নিয়ত ফিরে পাচ্ছি। আমার সঙ্গী মানুষটি বিজ্ঞানের আর প্রযুক্তির জগতের লোক কিন্তু সে পিয়ানোও বাজায়; সেলাই থেকে কাঠের কাজ, রান্না থেকে প্লামিং—কোনোটাই তার একেবারে অচেনা কাজ নয়। আমাদের একটি ছেলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুরোনো বইকে নতুন করার কাজের কারিগর, সপ্তাহে একটি দিন টেকনিকাল

কলেজে সে-বিদ্যায় পাঠ নেয়, অবসরসময়ে ছবি আঁকে। অন্য ছেলেটি এন্‌জিনিয়র হয়ে উঠছে, কিন্তু বেহালাও বাজায়, আর তারও আঁকার হাত আছে। সংগীত আমাদের সকলেরই প্রিয় হওয়ার ফলে আমাদের বাড়িতে তার এমন বন্যা বয় যে তাতে মধ্যে-মধ্যে মাথা ধ'রে যায়। তা ছাড়া বাড়ির প্রত্যেকে ঘরের কাজে হাত না লাগালে এ দেশে সংসার চলে না; জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ আমরাই ক'রে থাকি।

অর্থাৎ চারণবৈচিত্র্য এমনভাবে আমার পরিপ্রেক্ষিতের অঙ্গীভূত হয়েছে যে বস্তুত মিশ্রতা আমার কাছে কোনো ইশুই নয়। কিন্তু এটা আমার কোনো মেমসাহেবিয়ানা নয়; আমার এই স্বভাবের সূত্রপাত হয়েছিলো জন্মমুহূর্তেই। অবিমিশ্র শুদ্ধতার পূজা আমার লালনের অন্তর্গত ছিলো না। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘর নানারকমের হয়। আমি ঐতিহ্যপন্থী ঘরের মেয়ে নই। আমি নিজে অসবর্ণ বিবাহের সন্তান। যৌথ পরিবারে মানুষ হই নি। আমাদের বাড়িতে আনুষ্ঠানিক শুদ্ধতার কোনো স্থানই ছিলো না। আমরা আশৈশব সকলের হাতে খেয়েছি। আমার বাবার সংস্কারমুক্ত সেকুলার মন ছিলো। তিনি নিজে আমাকে নিজের পছন্দমতো বিয়ে করবার এবং গোমাংস ভক্ষণের অধিকার দিয়েছিলেন। আমার মাকে রান্নাঘরে স্নানের ঘরে শিশুপরিচর্যায় বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে দেখেছি, কিন্তু তাঁকে কখনো প্রাচীনপন্থী শুচি-অশুচির বিচার করতে দেখি নি—বস্তুত তাঁকে কোনো দিন কোনো পূজা-অর্চা বা ব্রতপালনও করতে দেখি নি। ফলে আমার মনটা 'সেকেলে' হয়ে উঠবার কোনো সুযোগই পায় নি।

মনে পড়ছে কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় আমার চোখে যখন অস্ত্রোপচার হয়—আমার জীবনের প্রথম প্রকৃত সংকট, যা আমাকে বড় হয়ে উঠতে অনেকটাই সাহায্য করে—তখন, বাঁধা চোখে হাসপাতালে শুয়ে থাকা অবস্থায়, একটি পরিচারিকা আমাকে পানীয় জল দিতে কী-আন্দাজ দ্বিধা করেছিলো। কেন? না, সে জাতে অস্পৃশ্যা, বেডপ্যান পরিষ্কার করাই তার কাজ। আমি তাকে বলেছিলাম: আমাদের বাড়িতে আমরা জাত মানি নে, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া মানি, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এসো, তা হলেই হবে।

এই যেমন আমি ব্যক্তিগত জীবনে চণ্ডালিকার স্পর্শদোষ মানি নে, তেমন এও মানি নে যে একটি আধুনিক প্রেমকাহিনীর স্পর্শে রবীন্দ্রনাথ আর ভিক্তোরিয়ার গল্পটা কালো হয়ে যেতে পারে। তাঁরাও মানুষ, আমার উপন্যাসের চরিত্ররাও মানুষ। যিনি নিজে একজন লেখক, মানুষের গল্প আর মানুষের অনুভূতি নিয়েই যাঁর কারবার, কয়েকটি ঔপন্যাসিক চরিত্রের সংস্পর্শে তাঁর মধ্যে কোনো দোষ লাগতে পারে, এইটে মনে করাই কি চূড়ান্ত ছেলেমানুষি নয়? রবীন্দ্রনাথ কি একজন স্পর্শকাতর বায়ুনঠাকুর যে কাল্পনিক চরিত্রদের ছায়া গায়ে পড়লে তাঁর জাত যাবে?

আমার বইটার মিশ্র আঙ্গিক যে কোনো দোষ নয়, বরং গুণ—এ কথা অনেক সমালোচক বলেছেন। গৌরী দেবীর লেখাটি হাতে পাবার পর ফাইল খুলে পুরোনো রিভিউ-এর কাটিংগুলো দেখছিলাম। আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন সমালোচক একটি দৈনিক পত্রিকায় লিখেছিলেন:

> ...মনোযোগী পাঠক যখন এই দুই অংশ মেলাতে গিয়ে দুটি অংশের মধ্যেকার অলিখিত কথনগুলি আবিষ্কার করতে থাকবেন তখন স্পষ্টতই তাঁর মনে হবে যে আঙ্গিককে শিকলে বাঁধার কোন মানে হয় না, 'যে পারে সে আপনি পারে'। কেতকীর এই গ্রন্থের আঙ্গিক নিয়ে যতই বিতর্কের অবকাশ থাকুক না কেন, তিনি যে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পেরেছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আঙ্গিকের আলোচনা অবান্তর। বরং গ্রন্থটির গভীরে প্রবেশ করলে অনেক নান্দনিক অনুভূতি মিলতে পারে।

এই মন্তব্যকেও কি একজন 'মুগ্ধ পাঠকের' কথা ব'লে উড়িয়ে দিতে হবে? আমি এঁকে না চিনলেও এই মনোযোগী রসজ্ঞ পাঠক আমাকে তো অনেকটাই চিনেছেন। 'চতুরঙ্গ'-এর পাঠকদের মনে রাখতে অনুরোধ করি যে গৌরী দেবীর বিপরীত মতটাও দৃঢ়ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে।

এবং বুঝতে পারি না, 'মননশীল লেখিকা' ব'লে সম্পাদক যাঁর পরিচয় দিয়েছেন, তিনি কেন নিজেকে 'সাধারণ পাঠিকা' ব'লে চিহ্নিত করতে চান? একটা বিতর্কিত বইয়ের প্রসঙ্গে 'চতুরঙ্গ'-এর মতো পত্রিকায় কলম ধরতে যখন রাজী হয়েছেন, এবং কড়া সমালোচনা লিখতে পিছপা হন নি, তখন 'সাধারণ পাঠিকা'-র ছদ্মবেশটা অবান্তর। বিশেষত সম্পাদকীয় পরিচিতিতে ব'লেই দেওয়া হয়েছে যে 'শুধু লেখার জন্য না লিখে তিনি কলম ধরেন সমাজ, সাহিত্য এবং মানুষের জন্য বিবেকের তাড়নায়, বিশেষ পরিস্থিতিতে অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদে'। ধ'রে নিতে হবে কি যে 'বিবেকের তাড়না'-তেই, আমার 'অবিবেকী' লেখনীকে শাসন করার জন্যেই তিনি কলম ধরেছেন? এদিকে আমরা যারা নেহাত লেখক, তারা তো সর্বদা কেবল বিবেকের তাড়নায় লিখতে পারি না। আমরা কখনো কখনো লেখার জন্যও লিখি, অর্থাৎ সৃষ্টির আনন্দে, আত্মপ্রকাশের তাগিদেও লিখি। রবীন্দ্রনাথও তো আমাদেরই দলে।

পরের প্রসঙ্গে যাবার আগে বলি, আমার এই বইটা কেবলই তার সন্ধানী গবেষণাকর্মের জন্য পুরস্কার পেয়েছিলো, গৌরী দেবীর এই ধারণাটি ভুল। পুরস্কারের দ্বারা কোনো শিল্পকর্মের মূল্য নির্ণীত হয় না, কিন্তু পুরস্কার যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁরা সেটা পুরো বইয়ের জন্যই দিয়েছিলেন, এই কথাটা পাঠকদের মনে রাখতে অনুরোধ করছি। আমাকে যে-সম্মানপত্র দেওয়া হয় সেখানে গ্রন্থের দুটি দিককেই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

* * *

ডরিস মায়ার যে তাঁর ওকাম্পো-জীবনচরিতে ঐ মহিলার প্রেমজীবনের চাইতে তাঁর জীবনের অনুরাগগুলির উপরেই বেশি ঝোঁক দিয়েছেন, এতে গৌরী দেবী স্বস্তি বোধ করেছেন। ঐ ঝোঁকপ্রদান কিছুটা মায়ারের স্বনির্বাচিত, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সেটা ছাড়া তাঁর সামনে আর কোনো পথও ছিলো না। ভিক্তোরিয়া তখনও বেঁচে, এবং তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর আত্মজীবনী বার করেন নি। কোনো কৃতী ব্যক্তির জীবদ্দশায় তাঁর প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা কখনোই সম্ভব নয়, কেননা জীবিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা অবশ্যই রক্ষা করতে হয়। ভিক্তোরিয়ার মৃত্যুর পরে তাঁর আত্মজীবনীর খণ্ডগুলি ক্রমে ক্রমে বেরোতে থাকে। আমার বাংলা বইটা যে-সময়ে লিখি (১৯৮১-১৯৮২) তার একেবারে শেষের দিকে ঐ আত্মজীবনীর প্রথম দুটি খণ্ড আমার হাতে আসে। বইয়ে তার উল্লেখও আছে। কিন্তু তৃতীয় খণ্ড বেরোনোর আগে ভিক্তোরিয়ার প্রেমজীবনের বিস্ফোরক সরক্ত রূপকে প্রত্যক্ষ করা যায় নি। ঐ খণ্ডের প্রকাশ লাতিন-মার্কিন বিদ্যাচর্চার জগতে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সেটি আমি পড়লাম ১৯৮৩ সালে, শান্তিনিকেতনে দু' মাস কাটিয়ে বিলেতে ফিরে আসার পরে। তখন আমি রবীন্দ্র-ভিক্তোরিয়ার চিঠিপত্র সম্পাদনা করবার দায়িত্ব নিয়েছি, এবং বাংলা বইটা ছাপতে গেছে, যদিও নানা কারণে বইটা ছেপে বেরোতে আরও দু' বছর দেরি হয়। সে যাই হোক, আমি সে-বছর বিলেতে ফিরে অক্সফোর্ডের গ্রন্থাগারে পা দিয়েই 'সুর' পত্রিকার উপরে গবেষণারত তরুণ গবেষক জন কিং-এর মুখে শুনলাম: 'তৃতীয় খণ্ড দেখেছেন?'

এ কথা আজকে জোর দিয়েই বলতে হবে যে ভিক্তোরিয়ার জীবনে তাঁর ভালোবাসার জীবন আর জীবনের ভালোবাসাগুলি দুটোই ছিলো সমান গুরুত্বপূর্ণ, সমান দাবিদার। মায়ার অনিবার্য কারণে দ্বিতীয় দিকটার উপরেই জোর দিয়েছেন, এবং কর্মে

প্রেমে মিলিয়ে ভিক্তোরিয়ার যে সমগ্র জীবন তার আলেখ্য হিসাবে মায়ারের বইটা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। 'লাভ্ লাইফ' আর 'লাভ্স্ অফ লাইফ' এ দুয়ের নিরবচ্ছিন্ন টেন্শন ভিক্তোরিয়ার জীবনের একেবারে কেন্দ্রে,—এই জিনিসটা না বুঝলে তাঁকে বোঝা হয় না। জিনিসটা আমি গোড়া থেকেই আন্দাজ করেছিলাম, এবং ঠিক সেই কারণেই ঐ ধরনের একটা টেন্শনকে অনামিকার জীবনেও সঞ্চারিত করেছিলাম। পরবর্তী কালে যা-কিছু জেনেছি সে-সমস্তই পশ্চাদ্দৃষ্টিতে আমার বাংলা বইটার নকশাকে সমর্থন করে।

'লাভ্ লাইফ' নিয়ে যেসব আধুনিকারা জট পাকিয়ে ফ্যালেন তাঁদের উদ্দেশে গৌরী দেবী বক্রোক্তি করেছেন। বলেছেন, সেই জটের ফাঁস ছাড়াতেই নাকি তাঁদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। মূল বিষয় (অর্থাৎ আমার বই) থেকে স'রে এসে তাঁর সমালোচনার এই অংশে তিনি বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে আধুনিক মেয়েদের ঠুকেছেন। বুঝতে পারছি না এই আক্রমণের লক্ষ্য কতটা আমি, কতটা অন্যরা। 'পরমা' নামটার উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। ব্রিটিশ টেলিভিশনের কল্যাণে অপর্ণা সেনের যে-দুটি ছবি দেখেছি সে-দুটি খুবই ভালো লেগেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ 'পরমা' ছবিটাই আমার কখনো দেখার সুযোগ হয় নি, যদিও অনেকের কাছেই তার প্রশংসা শুনেছি। সেই ছবি নিজের চোখে না দেখে অপর্ণা সেখানে কী বোঝাতে চেয়েছেন তা বলা শোভা পায় না। আমি কেবল আমার বইয়ে কী বোঝাতে চেয়েছি তার আভাস দিতে পারি। গৌরী দেবীর ভাষার জের টেনে বলা যায়, নারীর মুক্তিযুদ্ধে শয্যা কখনোই একমাত্র 'রণক্ষেত্র' হতে পারে না, তবে তা অন্যতম রণক্ষেত্র। প্রেম ও কর্ম দুয়েরই প্রয়োজন থাকে, এবং দুয়ের মধ্যে একটা নিগূঢ় যোগও থাকে। অন্তর্লীন প্রেমজীবন থেকে জীবনের সৃষ্টিশীলতা প্রবাহিত হয়। ভালোবাসতে পারার ক্ষমতাই ভিক্তোরিয়ার জীবনের সমস্ত শক্তির উৎস, যদিও প্রেমের বেদনা তাঁকে ছিন্ন করেছে। প্রেম পুরুষের সৃজনশীলতাকে কিভাবে প্রেরণা দেয় রবীন্দ্রনাথ সে-কথা বারে বারে বলেছেন। নারীর সৃষ্টিশীলতার বিকাশেও প্রেমের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই সত্যটার প্রকাশ্য স্বীকৃতির জন্য আজকের মেয়েরা যদি লড়াই করেন তো তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। দরিদ্র মেয়েদের অন্য লড়াইগুলির জন্য আমার গভীরতম সহানুভূতি বর্তমান; গৌরী দেবী আমার অন্যান্য লেখা পড়লে তার পরিচয় পেতেন। জীবনের অর্থ নৈতিক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমারও আছে। কিন্তু প্রেমের প্রয়োজন কেবল উঁচুতলার মেয়েদের একচেটিয়া নয়। দরিদ্র মেয়েদের জীবনেও যে প্রেমের প্রয়োজন থাকে তা সমাজসেবিকা গৌরী দেবী নিশ্চয় জানেন। এই প্রয়োজন সর্বজনীন।

গৌরী দেবী রবীন্দ্রনাথের চরিত্র মৃণালের কথা তুলেছেন। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অবশ্যই তারিফ করবার মতো, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, যৌথ পরিবারের গণ্ডির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেও, শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করা ছাড়া মৃণাল আর কী কী করবে তা আমরা জানি নে, গল্পে তার হদিস নেই। কাহিনীর শেষে সে যে মীরাবাঈ থেকে উদ্ধৃতি দেয়, এ থেকে হয়তো ধ'রে নেওয়া যায় যে ধর্মীয় জীবনকে আশ্রয় ক'রেই সে বাঁচবে। সে হয়তো বাঁচবে মীরার মতো ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত সাধিকা হয়ে। কিন্তু অধিকাংশ মেয়ের ক্ষেত্রেই প্রেম ও কর্ম যে ঢের বেশি ইহজাগতিক হবে, এমনটাই তো প্রত্যাশিত।

আমার উপন্যাসের নায়িকা কিন্তু অনেক কিছু করছে। সে স্প্যানিশ শিখছে, লাদিনো গান অনুবাদ করছে, যে-গবেষণা বঙ্গের অন্যান্য পণ্ডিতরা করলেন না এই মেয়েটি তার দায়িত্ব নিয়েছে। তার 'লাভ্ লাইফ', 'লাভ্স্ অফ লাইফ': দুটোকেই সে সামলাচ্ছে, প্রথমটার জট ছাড়াতে গিয়ে মোটেও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না। বরং দেখা যাচ্ছে যে তার প্রেমজীবনের অভিজ্ঞতা তাকে যে-অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছে

সেটাকে সে তার অনুসন্ধানে বিশ্লেষণে কাজে লাগাতে পারছে। তাই জানি না হঠাৎ কেন গৌরী দেবী তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন: 'এর পরেও কি আমাদের বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হবে এক শয্যার পরিবর্তে একাধিক শয্যায় আমাদের অধিকার সাব্যস্ত করতে?' এখানে তিনি কাকে ঠুকেছেন তা বুঝতে পারছি না, কেননা আমার নায়িকা তো ওভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমাকেই ঠুকেছেন নাকি? আমি ওভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছি এমন কোনো খবর কি তিনি পেয়েছেন?

হ্যাঁ, অবশ্যই: 'অত্যাধুনিক কাহিনীতেও' একটি মেয়ের পক্ষে প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি হয়ে ওঠা যে কত কঠিন তার আভাস দেবার প্রয়োজন থাকে। এটা কোনো 'অভিমানী অভিযোগ' নয়, সত্যের স্বীকৃতি-মাত্র। এই দেখুন না কেন, এই যে আমি ঐ বইটা লিখেছি—সেই লিখনকর্মও কি আমার (গ্রন্থকর্ত্রীর) ব্যক্তি হয়ে ওঠার অঙ্গ নয়? এবং আপনারা সকলে দেখতেই পাচ্ছেন এই 'হয়ে ওঠা' কত সুকঠিন, কেননা গ্রন্থপ্রকাশের ছ' বছর বাদে আজও আমাকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এবং 'ব্যক্তি হয়ে ওঠা' বজায় রাখার জন্য, তারই নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব-পালনে,—পালিয়ে না গিয়ে, তীর্থে না ছুটে, নিঃশেষ না হয়ে,—পয়েন্ট ধ'রে ধ'রে সমালোচনার জবাব দিতে হচ্ছে।

আমি নিশ্চয়ই মানি যে পুরুষদের পক্ষেও প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি হয়ে ওঠা নেহাত সহজ নয়, তাদের আত্মবিকাশের পথও গোলাপের পাপড়িতে ছড়ানো নয়। বাড়ির ভিতরে, বন্ধুদের মধ্যে বৃহত্তর সমাজে—সর্বত্রই কি অহরহ তাদের আত্মবিকাশের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করছি না? তবু তুলনামূলক বিচারে বলতেই হয় যে এখনও পর্যন্ত তাদের লড়াইয়ের চাইতে মেয়েদের লড়াইটাই বেশি রক্তাক্ত—প্রায় সব দেশেই। প্রায় সমস্ত সমাজেই ক্ষমতার আসল কলকব্জা এখনও পর্যন্ত পুরুষদেরই হাতে। গৌরী দেবী ভালোভাবেই জানেন যে দরিদ্রদের মধ্যে মেয়েরা দরিদ্রতর একটি দল। ওখানে আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমার বইয়ের সমালোচনা লিখতে ব'সে বেমক্কা 'উইমেন্স লিবের শৌখিন পাঁয়তারা'-কে ঠোকা, বা যাঁরা 'সেমিনার, সিম্পোসিয়ম-ওয়ার্কশপে নিরন্তর লড়াই করে চলেছেন নানা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফাউনডেশানের অর্থানুকূল্যে' তাঁদের আক্রমণ করা, বা যে 'গুটিকয় কৃতী মহিলা মই বেয়ে সমাজের সর্বত্র মগডালে উঠে পড়েছেন' তাদের উপরে হঠাৎ খেপে ওঠা বিসদৃশই দেখাচ্ছে, কেননা আমার বইটা কোনো উইমেন্স লিবের শৌখিন পাঁয়তারাও নয়, আমি কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে লড়াই করতেও নামি নি, আর আমি মই বেয়ে কোনো সমাজের মগডালেও চাপি নি, চাপতে চাইও না।

জানি না কেন গৌরী দেবীর এমন ধারণা হয়েছে যে ভিক্তোরিয়া 'তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম, বিবাহ, পুরুষসংসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে···শক্ত হাতে মোকাবেলা করার পর সেসবকে অতিক্রম করে চলে যেতে পেরেছিলেন দূর-দূরক্ষেত্রে'। ভিক্তোরিয়ার জীবনের প্যাটার্নটা মোটেও ওরকম নয়। সেখানে প্রেম আর কর্মের মধ্যে মোটেও ওরকম কোন আগে-পরে নেই। দুটোই এগিয়েছে মোটামুটি হাত ধরাধরি ক'রে। প্রেমের বেদনায় ছিন্ন হতে হতেই তিনি কাজ করেছেন,—ব্রহ্মচারিণী হয়ে গিয়ে নয়। একেকজন পুরুষের সান্নিধ্য তাঁর আত্মবিকাশের ও কর্মজীবনের একেকটি নতুন দিগন্তকে খুলে দিয়েছে। এটাই তাঁর জীবনের প্যাটার্ন। আমি জানি, ডরিস মায়ারের বইটাতে এই জিনিসটা খানিকটা চাপা পড়েছে। যেন অপরিণামদর্শী বিবাহ, জনৈক আইনজীবীর সঙ্গে গোপন প্রণয়, এবং তিনজন পৃথিবীখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মোকাবিলার পর তিনি শুধুই তাঁর কর্মজীবনকে নিয়ে থেকেছেন, পুরুষের প্রেমে সেই জাঁদরেল মহিলাকে আর নাকানি-চোবানি খেতে

হয় নি। এই ধারণা সর্বাংশে ভ্রান্ত। আমার ইংরেজী বইটাতে এই ভ্রান্তিনিরসনের কিছুটা চেষ্টা করেছি, কিন্তু যেহেতু সেখানেও খুব সংযতভাবেই কলম চালিয়েছিলাম, কোনো বাড়াবাড়ি করি নি, তাই সেই বইয়ের দ্বারাও সকলের ভ্রান্তি দূর করা যায় নি। পরে আমার ইংরেজী বইটার সমালোচনার সূত্রে এ বিষয়ে আরও কিছু খবর দিয়েছিলাম ‘জিজ্ঞাসা’ পত্রিকার ৯ : ৩ সংখ্যায়; অনুসন্ধিৎসুরা দেখে নেবেন।

এ কথা ঠিক যে ‘সুর’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভিক্‌তোরিয়া তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মধ্যে একটা বিরাট আশ্রয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তাই ব’লে তাঁর ‘লাভ্‌ লাইফ’ থেমে থাকে নি। তাঁর তিরিশের দশকের বিবর্তনের আলোচনাসূত্রে ফরাসী লেখক দ্রিয় লা রশেল-এর সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের কথা আমার ইংরেজী বইয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এ বিষয়ে ভিকতোরিয়া খোলাখুলি লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীর পঞ্চম খণ্ডে, যেমন তাঁর প্রথম অসামাজিক প্রণয়ের কথা লিখেছেন চাঞ্চল্যকর তৃতীয় খণ্ডে। দ্রিয় র পরেও আর্জেন্টাইন লেখক এদুয়ার্দো মাজেয়া ও ফরাসী লেখক রজার কাইওয়া তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এগুলি বন্ধুত্ব বটে, প্রেমও বটে। এসব বিদিত তথ্য। রজার কাইওয়ার দ্বিতীয়া স্ত্রীকে আমি নিজে প্যারিসে ইন্টারভিউ করেছিলাম। এঁরা ছাড়া আরও দু’-একজন ভিকতোরিয়ার প্রেমিক হয়েছিলেন। শুনেছি পূর্বপ্রত্যাখ্যাত অর্তেগা-ও অবশেষে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

কথা হচ্ছে, রক্ষণশীল ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভিক্‌তোরিয়ার জীবনের এই দিকটাকে কোনোমতেই বোঝা যাবে না। নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশে, তার সৃজনশীলতার প্রস্ফুটনে যৌন প্রেমের ভূমিকা ভারতীয় সমাজে স্বীকৃতি পায় নি। মেয়েদের কর্মে অধিকার সহজেই স্বীকৃতি পেয়েছে, কেননা ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে, গীতার বচনের সঙ্গে তাকে অনায়াসেই খাপ খাওয়ানো যায়। এমন কি, সেই সুযোগে মেয়েদেরকে দিয়ে আরও বেশি ক’রে খাটিয়ে নেওয়া যায়। এর ফলে মেয়েরা আজকে ঘরে-বাইরে আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ বেশি খাটছেন। কিন্তু মেয়েদের প্রেমে অধিকার, passion-এ অধিকার, pleasure-এ অধিকার ভারতীয় সমাজে স্বীকৃতি পায় নি। যারা সেই স্বীকৃতির জন্য লড়ছে, তাদের কি গৌরী দেবীদের মতো নিরলস বিবেকী সমাজকর্মীদের হাতে ইট-পাটকেল খেতে হচ্ছে না? এই আলোচনাই কি তার প্রমাণ নয়?

এই ব্যাপারে গৌরী দেবীর আর আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মূলগত প্রভেদ থাকায় আমার বাংলা বইটার উপন্যাস-অংশের রসগ্রহণ তিনি করতে পারেন নি। একজন আধুনিক মেয়ে কেমন হয়, তার কেমন হওয়া উচিত—সে-বিষয়ে তাঁর মনের মধ্যে একটা স্টিরিওটাইপ তৈরি হয়ে আছে। সেই ভাবমূর্তি পিউরিটান ছাঁচে গড়া, মনে হয় ব্রাহ্ম মডেলেরই বিবর্তন। সেই আদর্শ মেয়েটি অভিমানের ভাষা ব্যবহার করে না, পুরুষদের কড়া-কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারে, তাদের ‘শক্ত হাতে’ দমন ক’রে কাজের দিকে এগিয়ে যেতে জানে। আমার নায়িকা তার সঙ্গে মেলে না। তাই তাঁর মনের আয়নায় অনামিকা নামে মেয়েটির যথোচিত প্রতিফলন হয় নি। তিনি তাকে পদে-পদে ভুল বুঝেছেন। সেইসব খুঁটিনাটির মধ্যে যাবার আগে গ্রন্থমধ্যস্থ সাধুভাষার ব্যবহার নিয়ে কিছু ব’লে নি। বইয়ের মাঝখানে দুটি অধ্যায়ে কেন সাধুভাষা ব্যবহার করেছি, গৌরী দেবী এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কেন এটা করেছি? না, তিনি যা-যা ভেবেছেন, তা নয়। এটা প্রধানত একটা শৈলীগত, নান্দনিক সিদ্ধান্ত। সংগীতে নৃত্যে অভিনয়কলায় সিনেমায় মেজাজ ও লয়ের বদলের, একটা ‘মুভমেণ্ট’ থেকে আরেকটা ‘মুভমেণ্ট’-এ চ’লে যাবার যে অবকাশ থাকে তাকে আমি নিছক শব্দশিল্পী হিসাবে বরাবরই ঈর্ষা করি। আমার একটা ইংরেজী কবিতায় একবার লিখেছিলাম: ‘Music’s more eloquent’। নানান মাধ্যমের শিল্পকলার রসগ্রহণ ক’রে বেড়াই ব’লেই শব্দদের সীমাবদ্ধতা আমাকে প্রায়ই পীড়া দেয়। বিষয়বস্তু একটা লয়-বদল দাবি করছে, কিন্তু শব্দদের মাধ্যমে তাকে কিভাবে বোঝানো যায়? আমার তাগিদটা যেন সিমফনিক, কিন্তু সিমফনি তো লিখছি না, লিখছি উপন্যাস। হঠাৎ ওখানে একটা নতুন বাদ্যযন্ত্র ঢুকিয়ে দেবো, তার তো কোনো অবকাশ নেই। তা হলে একটা সম্পূর্ণ নতুন ছন্দের ইঙ্গিত—বিষয় যা দাবি করছে—তাকে ভাষায় কিভাবে চারিয়ে দেওয়া যায়? সৌভাগ্যবশত বাংলায় চলিত-ভাষা থেকে সাধুভাষায় চ’লে যাবার সুযোগ আছে। টেকনিক হিসাবে সেটিকে গ্রহণ করলাম। ওখানে সাধুভাষার আকর্ষণ প্রধানত তৎসম শব্দদের জন্যে নয়। তৎসম শব্দ আমি দরকার পড়লেই ব্যবহার ক’রে থাকি, তা নিয়ে আমার কোনো সংকোচ বা মাথা-ব্যথা নেই। আমার কাছে ওখানে সাধুভাষার প্রধান আকর্ষণ ছিলো তার আকারে দীর্ঘতর ক্রিয়াপদগুলির মন্দমন্থরতর গতি (বলতে পারেন ‘গজগমন’), তার ধীরতর অলংকৃততর রাজকীয়তর ছন্দ। ঐ পরিবর্তনের সাহায্যে আমি আমার বিবৃতিতে একটা অন্য মাত্রা আনতে চেয়েছিলাম, যা বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে খাপ খায়। একই সঙ্গে যোগ করতে চেয়েছিলাম আয়রনির একটা সূক্ষ্ম আভাস। অনামিকা তার এই এনকাউণ্টারটার কাছে যে-প্রত্যাশা নিয়ে এসেছে তা এই মুহূর্তে তাকে কিছু দিলেও তা যে প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণ হবে না—তারই একটা ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলাম। সে এখনও তা জানে না, কিন্তু ঐ রাত্রিটুকুর আর পুনরাবৃত্তি হবে না। তা ক্রমশ দূরে চ’লে যাবে, ঠিক যেমন সাধুভাষা আমাদের জগৎ থেকে দূরে চ’লে গেছে। কেবল অনামিকার স্মৃতিতেই তার অস্তিত্ব থাকবে। তাই আমি তার ঐ অভিজ্ঞতাটার চার দিকে একটা গণ্ডি টেনে দিতে চেয়েছিলাম, ছবি আঁকা হয়ে গেলে চিত্রশিল্পী যেমন তাকে ফ্রেমে বেঁধে ফেলতে পারে—অনেকটা সেইভাবেই। আমার সাধুভাষা সেই গণ্ডি, সেই ফ্রেম। তার ভিতরে যা রইলো তার একটা সৌন্দর্য আছে, কিন্তু তা তখনই দূরে স’রে যাচ্ছে।

বেশ কিছু পাঠক কিন্তু এই অধ্যায় দুটির শৈলীকে মনোজ্ঞ মনে করেছিলেন। কলকাতার একটি ইংরেজী কাগজে একজন পাঠক তাঁর ভালোলাগাকে ব্যক্ত করেছিলেন এইভাবে:

> ...this reader will cherish these pages as one of the boldest and most sensitive portraits of a tense, turbulent night when the conflicting motives of lovers criss-crossed in between copulations to reveal two differing hearts behind a common craving.

অবশ্য গৌরী দেবী এই প্রতিক্রিয়াকে একজন ‘মুগ্ধ’ পাঠকের প্রশস্তি ব’লে উড়িয়ে দিতে পারেন।

* * *

এবারে আসছি উপন্যাস-বিষয়ে গৌরী দেবীর মন্তব্যগুলির খুঁটিনাটিতে। এক জায়গায় আমার ‘দৈব’ শব্দের ব্যবহারে তিনি মন্তব্য করেছেন: ‘দেখা যাচ্ছে ইমানসিপেটেড মহিলারাও প্রয়োজনমত দৈবের উপর খানিকটা দায়িত্ব চাপিয়ে আরাম বোধ করেন।’ ‘দৈব’ বলতে ওখানে ভাগ্য বা অদৃষ্টকৃত আপতিক ঘটনাসমাবেশকেই বোঝানো হয়েছে। আমাদের জীবনের অনেক ঘটনাতেই ভাগ্যের আশ্চর্য খেলা দেখা যায়, যার ফলে আমাদের জীবন বদলে যায়, মোড় নিয়ে নেয়—এ-কথা কি অস্বীকার করা যায়? এর পর ‘একজন স্বাধীন আধুনিক মহিলার মুখে’ সামান্য একটু অভিমানের ভাষাও তাঁর কানে ‘বেমানান’ ঠেকেছে। কিন্তু আমি তো উপন্যাস লিখছি, আদর্শ চরিত্রের মডেল তো তৈরি করছি না। মান-অভিমানের ভাষাকে বাদ দিয়ে যে কোনো

প্রীতির সম্পর্ক হয় তা তো আজ অবধি দেখলাম না। কী মুশকিল, আমি তো দেখেছি পুরুষরা পর্যন্ত অভিমান করে। আর ভিক্‌তোরিয়া নিজে কী-আন্দাজ অভিমানিনী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের উপরেও কত অভিমান করেছেন। আর হ্যাঁ, অনামিকা অশনিকে অবশ্যই 'ব্যবহার' করতে চায় না। সে ব্যবহৃতও হতে চায় না, কাউকে ব্যবহার করতেও চায় না।

গৌরী দেবী তাঁর সমালোচনায় 'মোহ-অঞ্জন' আর 'মোহমুক্ত' শব্দদুটি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা আমাদের সংবেদনের পার্থক্যের সূচক। স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ একরকমের কেমিস্ট্রি : মোহের অঞ্জন তার মধ্যে থাকবেই। জীবনের এই সত্যটাকে কী ক'রে উপেক্ষা করি? আমি তো হিতোপদেশ লিখতে বসি নি।

তার প্রাক্তন রতিকুশলতা সম্পর্কে অশনির প্রভাতী মন্তব্যটি কথনোই 'উল্লসিত' মেজাজে নয়, একটা স্মৃতিবিধুর নস্টালজিয়ার মেজাজে। ওখানে গৌরী দেবী আমার ভাষার সূক্ষ্ম ইঙ্গিতকে ধরতে পারেন নি। ঐরকম একটা স্বীকারোক্তি পুরুষরা কখনোই উল্লসিত মেজাজে করবে না, তার মধ্যে একটা বেদনা থাকবে। পুরুষ বন্ধুদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পারেন—এর বেশি আর কী বলতে পারি? অনামিকার প্রভাতী বিষণ্ণতাই বা তাঁর কাছে এত দুর্বোধ্য ঠেকেছে কেন জানি না। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার মেজাজের যে-ওঠানামা দেখিয়েছি, আমার কাছে সেইটেই স্বাভাবিক। তা ছাড়া 'রমণোত্তর বিষাদবোধ' মনস্তত্ত্বেও স্বীকৃত।

জন স্টলওয়ার্দির কবিতা থেকে বরফ-পড়া বিষয়ে যে-লাইনগুলি অনামিকা আওড়ায়, তাদের তাৎপর্যও গৌরী দেবীকে এড়িয়ে গেছে মনে হয়। তিনি প্রশ্ন করেছেন : 'আধুনিকারাও এত অল্পে "bruised" হন?' বস্তুত ঐ উদ্ধৃতিতে পৃথিবীর বিক্ষত অবস্থার কথাই বলা হচ্ছে, আর যে-মানবিক ক্ষতিবোধের ইঙ্গিত অভিপ্রেত তা নায়িকার অকালবৈধব্যের। তার সেই ব্যথার উপরে নতুন অনুরাগের প্রলেপ পড়ছে, তাকে শান্তি দিচ্ছে—তুষারপাতের মতো। কিন্তু এখানেও একটা আয়রনি আমার অভিপ্রেত : এই অনুরাগ তাকে শান্তি দেবে না। উদ্ধৃতিটুকুতে কবি-ব্যবহৃত প্রেমবাচক ইংরেজী শব্দটি থাকায় ঐ পবিত্র শব্দটি অপবিত্রীকরণে গৌরী দেবীর 'সেকেলে মন হায় হায়' ক'রে উঠেছে। এদিকে আমার 'একেলে মন' যে বলছে : হায় হায়, গৌরী দেবী যে দেখছি প্রেমের কাহিনীর আলোছায়া বোঝেন না—মোহবন্ধন বা মায়ার খেলার মধ্যে ধরা দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে একটু একটু ক'রে তাল কেটে যাওয়া আরম্ভ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাল কেটে গেলেও যে সত্যিই প্রেমে পড়েছে সে যে সুরটাকে অনেকক্ষণ ধ'রে রাখতে চেষ্টা করে, তার কানে সেই রেশ যে অনেকক্ষণ লেগে থাকে, এইসব কথা।

একেক সময় তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা বোঝাতে গিয়ে গৌরী দেবী বহুবচনের আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে তিনি সুবিধা নিচ্ছেন। নিজে সমালোচনা লিখছেন, নিজের কথা বলুন, বা বড় জোর বলতে পারেন : 'আমি আর আমার বন্ধুরা মনে করি' ইত্যাদি। কিন্তু গৌরবে সার্বিক বহুবচন ব্যবহার করাটা তাঁর পক্ষে সমীচীন নয়। সব পাঠকের প্রতিভূ তো তিনি নন।

মারগ্রিট যখন ব্রাইটনে বেড়াতে আসে তখন অশনির সঙ্গে তার সম্পর্ক যে ঠিক কিরকম তা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। সে অশনির শয্যাসঙ্গিনীরূপেই এসেছে কিনা তা সঠিক জানা যায় না। সেখানে একটা কুয়াশা আছে। সেটাই আমার অভিপ্রেত। হয়তো ব্রাইটনে থাকাকালেই সে প্রথম অশনির শয্যাসঙ্গিনী হয়, কিন্তু সেটাও হলফ ক'রে বলা যায় না। টয়লেটের জলে যে-জন্মনিরোধকটা ভাসছে সেটা কিছুই প্রমাণ করে না। সেটা যে অশনিরই পরিত্যক্ত তা বলা যায় না, কেননা সেটা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ছাত্র জেফ্‌-নামক যুবকটিরও কীর্তি হতে পারে—তার বৌ ম্যাণ্ডি তাকে দেখতে এসেছে। এই দ্ব্যর্থকতা আমার অভীষ্ট নকশার অন্তর্গত। আমি দুঃখিত যে এইসব খুঁটিনাটির ইঙ্গিত গৌরী দেবীকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে।

অনামিকার মুখে আমি যে-কথা সাবালিকার ক্রোধের ভাষা হিসাবে বসিয়েছি সেটা গৌরী দেবীর কানে 'খণ্ডিতা নারী'-র 'চিরকালের এক্‌সপ্লয়টেড সামান্যা মেয়ের' কপাল চাপড়ানোর মতো মনে হয়েছে। এখানে নাকি 'আধুনিক স্বাধীন রমণীর গুমর···খানখান হয়ে' গেছে, তাঁর নাকি পড়তেই লজ্জা। কিন্তু তিনি এখানে আমার ভাষার ব্যঞ্জনাই ধরতে পারেন নি। অনামিকা এখানে কপাল চাপড়াচ্ছে না, সে চ'টে গেছে। আবার, চ'টে গেছে ব'লেই যে সে পরমুহূর্তে পাততাড়ি গোটাবে এইটে ভাবলে মানুষের মনকে বোঝা হয় না। আধুনিক মেয়ে হওয়া মানে কোনো কাগজের মানুষ বা যান্ত্রিক পুতুল হওয়া নয়, কোনো কাটা-ছাঁটা ফরমুলার অনুসরণ নয়। গৌরী দেবী লিখেছেন, 'কিন্তু বুঝতে পারি না, অনামিকার আশা করার ক্ষমতা অসীম, না তার নির্‌বুদ্ধিতা।' প্রেমে পড়লে মানুষের আশা করার ক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তার আচরণ অপরাপর সামাজিক জীবদের কাছে নির্‌বুদ্ধিতার মতো ঠেকে—এইটেই জীবনের বাস্তবতা। একজন আধুনিক মেয়ে যখন প্রেমে পড়ে, তখন তার মধ্যেও এই সামান্য লক্ষণ ফুটে ওঠে। অশনি না প'ড়ে থাকুক, অনামিকা তো প্রেমে পড়েছে। সে তো একরাত্রির মোলাকাত চায় নি, একটা সম্পর্ককেই গ'ড়ে তুলতে চেয়েছে। প্রেম তো তার কাছে দর কষাকষির ব্যাপার নয়। তাই ক্ষণে ক্ষণে তালভঙ্গ হতে থাকলেও তার আলেয়াকে সে যে আরও কিছু দূর অনুসরণ করবে, অশনিকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করার জন্য ঝাঁটা হাতে ধেয়ে যাবে না—এটাই প্রত্যাশিত। হাজার হোক, যে গবেষণায় অধ্যবসায়ী, তার পক্ষে প্রেমেও অধ্যবসায়ী হওয়াটা বিচিত্র নয়। কিন্তু গৌরী দেবীর কাছে এই অধ্যবসায় দুর্বোধ্য। তিনি বিরক্ত হন এই দেখে যে 'যথাস্থানে মানে মানে নিরস্ত হওয়া' অনামিকার 'স্বভাবে নেই'। না, নেই; ঐ যে তার নিজের বক্তব্য বোঝানোর তাগিদ—ওখানেই সে আধুনিকা, গৌরী দেবীর মনের ভিতরে যে-মডেলটা আছে তার নিয়ম মেনে নয়, ভিন্ন এক মডেলের আধুনিকা। সেখানে ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গেই তার সাদৃশ্য। তিনিও মানে মানে নিরস্ত হওয়ার মেয়ে ছিলেন না।

বিরহের 'কাল্‌ট্' সম্বন্ধে অনামিকার বিশ্লেষণটা গৌরী দেবীর কাছে 'অসহ্য ধৃষ্টতা' বলে মনে হয়েছে। অথচ জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিস্‌পানিক হরাইজন' পত্রিকায় অধ্যাপিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-কৃত সমালোচনায় এই বিশ্লেষণটি সপ্রশংস উল্লেখ পেয়েছিলো। শুনেছি ভারতীয় উপন্যাস সুপণ্ডিত বহুভাষাবিদ্ মীনাক্ষী দেবীর বিশেষ চর্চার ক্ষেত্র। তাঁর কাছ থেকে প্রশংসামূলক সমালোচনা পেয়ে গর্বই বোধ করেছিলাম। হায়, তিনিও কি আমার একজন 'মুগ্ধ' পাঠিকামাত্র? গৌরী দেবী দুঃখের সঙ্গে লিখেছেন, 'আমার কষ্ট হয়েছে এই জন্য যে এমন সংবেদী লেখিকার কাছ থেকে আমি আর-একটু সফিস্টিকেশান প্রত্যাশা করেছিলাম।' কিন্তু উপন্যাস আর গবেষণার রেখাগুলো পরস্পরকে কোথায় কোথায় কাটে তা যদি তাঁকে বোঝাতে না পেরে থাকি, তা হলে 'সংবেদী লেখিকা' আর হলাম কিসে? সে-ক্ষেত্রে ও কথা বললে আমাকে ব্যঙ্গই করা হয়। বরং এ কথা বললেই অকপটতর হতো যে তাঁর চোখে আমি 'সংবেদী লেখিকা' হয়ে উঠতে পারি নি। ওদিকে মীনাক্ষী দেবী যে তাঁর রিভিউ-এ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন :

> It is difficult to summarize the complex argument about feminine identity and female sexuality that is spread over nearly a hundred pages in the book touching

upon a wide range of human thought..., but it indicates the maturity and complexity of argument that is the hall-mark of the book.

তিনি যে এই বইকে বলেছিলেন 'a powerful book that defies categorization'? তা হলে কোন্ সমালোচক ন্যায্য কথা বলছেন? কে বেশি নির্ভরযোগ্য, কে সঠিক পথের দিশারী? আমিও কি উলটে বলতে পারি না—'গৌরী আইয়ুবের মতো মননশীল সমালোচকের কাছ থেকে আমি আরেকটু সফিস্টিকেশান প্রত্যাশা করেছিলাম'?

আসলে গোলমালটা কেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে গৌরী দেবীর একটা আগ্রহ আছে; তাই তাঁর সম্পর্কে গবেষণাটুকু তাঁর কাছে গ্রহণীয়। 'চপলতার স্পর্শ'-টুকু বাদ দিয়ে সেই অংশটা তিনি নিতে পারেন, নীর বর্জন ক'রে ক্ষীর গ্রহণের মতো। অবশ্য আমার ধারণা, গুরুদেব অনামিকার মেয়েলী চপলতাটুকুও ক্ষমা ক'রে দিতেন। এদিকে উপন্যাসটাকে কিন্তু গৌরী দেবীর নেহাত 'পরগাছা' ব'লেই মনে হয়েছে। অনামিকা মেয়েটাকে তাঁর একদম বাজে লেগেছে। অশনির সঙ্গে তার অপরিণামদর্শী ঘনিষ্ঠতার কাহিনীটা তাঁর শুচিতাবোধকে পীড়া দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়ার গল্পটা 'মানবিক-সাহিত্যিক আবেদনে কী অসম্ভব সুন্দর', আর অনামিকার গল্পটা এত খারাপ যে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন: 'কী বস্তু যে এই গবেষণার গায়ে লেপটে দেওয়া হয়েছে...'। তাঁর লেখা প'ড়ে মনে হয় আমি যেন পুজার ফুলের গায়ে ইচ্ছে ক'রে বিষ্ঠা লেপটে দিয়েছি। কয়েকটি উদ্ধৃতি দেবার সময়ে তাঁর কলম সরছিলো না—এমনই অপবিত্র আমার উপন্যাসটা। তবু কোথায় তাঁর আপত্তি তা বোঝাবার জন্য তিনি স্পষ্টোক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। কেন যে কবি ও বিজয়ার ঐ গল্পে আমি 'খাদ' মেশাতে গেলাম? এখানে এটাই তো গৌরী দেবী আর আমার মধ্যস্থ ইডিয়োলজিগত ব্যবধান। ঐ নামী দুজনের গল্পটা সোনা আর অন্য দুজনের গল্পটা খাদ—আমার বই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু জানতেন যে একটা জায়গায় আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।

গৌরী দেবীকে অনুরোধ করছি, তাঁর অবস্থান যে কতদূর আয়রনিকাল তা একটু চেষ্টা ক'রে বুঝে নিতে। প্রেমজীবনের অসামাজিকতাই যদি বিচারের নিকষ হয়, তা হলে ভিক্তোরিয়া আর অনামিকার মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না। ভিক্তোরিয়ার প্রেম-জীবন সামাজিক নিয়মের ধার ধারে নি; পরবর্তী কালের কথা যদি ছেড়েও দিই, তবু মনে রাখা যেতে পারে যে ঐ ১৯২৪ সালে, রবীন্দ্রনাথকে অতিথিরূপে পাবার সময়ে ভিক্তোরিয়া যে-মানুষটির গোপন প্রণয়িনী, তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর 'কাজিন', অর্থাৎ ভারতীয় বিচারে মানুষটি তাঁর 'তুতো' সম্পর্কের ভাশুর বা দেওর। এতে আমার কিছুই যায়-আসে না, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমে না, কিন্তু মানতেই হবে যে রক্ষণশীল বিচারে ভিক্তোরিয়া 'কুলবতী নারী' ছিলেন না। তিনি কবির বিজয়া ব'লে পার পাবেন, আর বেচারী অনামিকা তার সংক্ষিপ্ত ব্যর্থ প্রণয়ের জন্য নিন্দিত হবে, এই দুজনের জন্য দু'-রকমের মানদণ্ড আমার কাছে অগ্রাহ্য।

গৌরী দেবীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়ার কাহিনীর সমান্তরালে অশনি-অনামিকার কাহিনীটা পরিবেশিত হতে পারে না—'যৌক্তিক, নান্দনিক কোনো বিচারেই'; পাঠকদের ঐ জিনিসটা গিলিয়ে আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতাভাজন হই নি। আমার বিবেচনায় তাঁর এই বিচার বালির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর যুক্তি যে নান্দনিক নয়, এক ধরনের শুচিবায়ু, এ কথা তিনি স্বীকার করবেন না তা আগে-ভাগেই ব'লে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করুন, বা নাই করুন, তাঁর বিচারপদ্ধতিটা সত্যিই নান্দনিক নয়, তাঁর বিশেষ ঘরানার শালীনতাবোধের প্রয়োগমাত্র।

আর সেই শালীনতাবোধের মাপকাঠিটাও কার্যত বালিতে ডুবে যাচ্ছে। ভিক্তোরিয়া তাঁর স্বামীর জীবৎকালে স্বামীর তুতো-ভাইয়ের গোপন প্রেমিকা; অনামিকা বিধবা, তার প্রেম অন্বেষণ অবৈধ নয়, সে একটি রাত একজনের সঙ্গে কাটিয়েছে। কে বেশি 'খারাপ মেয়ে' তা কি মেপে দেখানোর কোনো উপায় আছে?

গৌরী দেবীর নীতিবোধ তাঁর: তা নিয়ে তর্ক করতে চাই না। কিন্তু তাঁর বিচার সাহিত্যসমালোচনা হয় নি। এই বইয়ের উপন্যাস-অংশটার প্রতি তিনি সুবিচার করতে পারেন নি। এর মধ্যে অনেক খুঁটিনাটির কাজ আছে: কারুণ্য আছে, কৌতুক আছে, একটা বিশেষ আবহ আছে, গার্হস্থ জীবনের ছবি আছে, কিশোর-কিশোরীদের আর প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের প্রতিকৃতি আছে, লাদিনো গানের গীতলতার সাহায্যে বইটার দুটো দিকের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দেওয়া আছে। কোনো-কিছুকেই তিনি পাত্তা দেন নি। নৈতিক কারণে অনামিকাকে তাঁর ভালো লাগে নি ব'লে পুরো গল্পটাকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা ওভাবে হয় না। উপন্যাসটা যদি খারাপ মনে হয়ে থাকে, তবে তা কেন খারাপ? সমকালীন অন্যান্য বাংলা উপন্যাসের পাশাপাশি কিসে নিকৃষ্ট? আমার নিজের অন্যান্য সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি কোথায় কোথায় ত্রুটিযুক্ত? তিনি নিজেই আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন 'কৃতী সাহিত্যিক' হিসাবে। এ বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা শোভনই হতে পারে না। কেবল তর্কের খাতিরে এ কথা মেনে নিয়ে বলা যেতে পারে: তা বেশ তো, তা যদি হয়, কোনো কৃতী সাহিত্যিকের লেখা খারিজ ক'রে দেবার সময়ে কিন্তু সমালোচকের কিছু দায় থাকে। যেমন ধরুন, যে-জিনিসটা খারিজ ক'রে দিচ্ছেন সেটা আমার দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রকৃত সাহিত্যসমালোচক কৃতী লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস খারিজ ক'রে দেবার সময়ে তাঁর প্রথম উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখাবেন কেন দ্বিতীয় কাজটা তেমন ভালো হয় নি, তা কোথায় কোথায় দোষযুক্ত, কেন প্রথমটা জমজমাট আর দ্বিতীয়টা ফিকে। গৌরী দেবী এ-সমস্তর মধ্যেই যান নি। যদি তিনি সত্যিই আমার প্রথম উপন্যাসটার সঙ্গে দ্বিতীয়টা মিলিয়ে নিতেন, তা হলে দেখতে পেতেন যে দুটো বই-ই এক হাতের কাজ: প্রথম বইটাও আঙ্গিকের দিক দিয়ে পরীক্ষামূলক, অনামিকা নোটনেরই উত্তরসূরি। বইটার শেষে নোটন স্প্যানিশ শিখছে। সেই মেয়েটাও মানে মানে নিরস্ত হয় না, লম্বা লম্বা চিঠি লেখে, ডায়েরির পাতা ভরায়। তাকে ঘিরে আছে আরও কত বাক্সমর্থ মেয়ে। পুরবী আর সৌগতর পূর্বসূরিরাও ওখানে আছে। এমন কি, নোটন নামে মেয়েটাকে মিশ্রতার সপক্ষে পর্যন্ত সোচ্চার হতে দেখা যায়। তার বান্ধবী রোহিণীকে সে লেখে:

> সঙ্করতা আমার প্রিয়। যেসব জিনিস মিশ্র, দোআঁশলা, অবিশুদ্ধ, সেসব আমার বরাবরই পছন্দ, তুই তো জানিসই, রোহিণী। যখন একটার মধ্যে অন্যটার আভাস আসে, ছায়া দেলে, ছোঁয়াচ লাগে, সন্দেহ জাগে, তখন সে প্রপঞ্চের রহস্যময়তা বড্ড টানে আমাকে।

এই লাইনগুলিকে পরবর্তী বইটার 'মটো' বলা যায়, যদিও লাইনগুলি যখন লিখেছি তখন পরের বইটার কোনো আদরাও মাথায় রূপ নেয় নি।

কিন্তু গৌরী দেবীর কাছে এ ধরনের তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত অবান্তর, কেননা আমার সাহিত্যিক বিবর্তনে তাঁর কোনো কৌতূহলই নেই, তিনি মূলত রবীন্দ্রকৌতূহলী। এ কথা বলা হয়তো অন্যায় হবে না যে সাহিত্যিক কেতকীকে খানিকটা না বুঝলে আলোচ্য বইটা বোঝা যাবে না; যাঁরা প্রথমটাকে ফালতু কাজ মনে ক'রে বইটা থেকে শুধুই রবীন্দ্র-বিষয়ক গবেষণাটুকু নিংড়ে নেবার চেষ্টা করবেন, তাঁরা তাঁদের সাচ্চা ছানাটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন, কিন্তু তাঁরা পুরো বইটার যথার্থ বিচারক হয়ে উঠতে পারবেন না।

তাই গৌরী দেবী তাঁর জুন মাসের সমালোচনার একেবারে শেষে হীরে আর কাচের যে-তুলনাটা টেনে এনেছেন সেটা দিশারী নয়। তাঁর ভাষার জের টেনে বলি, না, হীরেজহরতের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, আমি কাচের বেসাতি ক'রেই খুশী। কাচ একটি মূল্যবান জিনিস—কাচের চুড়ি থেকে জলপানের গেলাস, শৌখিন মদিরাপাত্র থেকে বেলোয়ারী লণ্ঠন, আয়না থেকে চশমার কাচ, আলমারির কাচের পাল্লা থেকে জানলার শার্শি, কলঘরের জানলার ঘষা কাচ থেকে গির্জার জানলার রঙিন চিত্রময় কাচ : কত রকমের যে তার ব্যবহার। কাচকে বাদ দিলে ল্যাবরেটরি থেকে হাসপাতাল কিছুই চলবে না। কাচের প্রধান উপাদান হচ্ছে সিলিকন ; তা দিয়ে তৈরি হয় সিলিকন চিপ্, যা কিনা আধুনিক ইলেকট্রনিকস্‌কে সচল রাখে। তাকে ছাড়া আজকের সভ্যতার চলবেই না। অতএব মনে করুন না কেন যে আমার ঝুড়িতে সবই কাচের জিনিস : কোনোটা সাদা বা ম্যাড়মেড়ে, কোনোটা রঙিন বা ঝকমকে, কিন্তু সবই কাচনির্মিত। আমি কাউকেই ঠকিয়ে হীরের সঙ্গে কাচ গছিয়ে দিতে চাইছি না, বরঞ্চ গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আমার প্রত্যেকটা মালই কাচের জিনিস। ইচ্ছে হলে নেবেন, নয়তো অন্য দোকানে যাবেন, কিন্তু একটু সাবধানে ব্যবহার করবেন, কারণ কে না জানে যে অসাবধান হলে কাচ টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে পারে, আর তখন হাত-টাত কেটে রক্ত পড়তে পারে।

* * *

এবার জুলাই মাসে প্রকাশিত গৌরী দেবীর লেখাটির সূত্রে আমার বক্তব্য রাখছি। অনুমান করি তিনি বাংলা বইটার দ্বিতীয় মুদ্রণ পড়েছেন। সেটি খুব তাড়াহুড়ো ক'রে করা, এবং ও ব্যাপারে আমার কোনো তত্ত্বাবধানও ছিলো না। কেন যে ঐ মুদ্রণটির এমন কালি-ধেবড়ানো চেহারা তা আমারও অজ্ঞাত। আর ইংরেজী বইটার 'নয়নশোভন' লে-আউটের কৃতিত্ব আমার স্বামীর। এ বইটার পাতাগুলির 'ক্যামেরা-রেডি কপি' আমরাই বাড়িতে তৈরি ক'রে দিল্লীতে পাঠিয়েছিলাম ; সেখানে অফসেটে ছাপা হয়। এখানে ছাপার ভুল পেলে আমাকে দোষ দেবেন ; টাইপ নির্বাচন আর পৃষ্ঠাগুলির লে-আউটের দায়িত্ব ছিলো আমার স্বামীর। আমি খুশী যে এ ব্যাপারে গৌরী দেবীকে আরাম দিতে পেরেছি ; আমি নিজেও বড় সাইজের টাইপ আর ফাঁক-ফাঁক ছাপা পছন্দ করি—আজকাল যা সহজে মেলে না।

ইংরেজী বইটার ছাপার প্রশংসার পরই আমাকে হোঁচট খেতে হয় একটি ব্যাপারে। গৌরী দেবী ফিরে গেছেন আমার বাংলা বইটাতে, এবং আমার ভাষাকে তুলোধোনা করেছেন। ভালো বাংলা গদ্য আমি নাকি মধ্যে-মধ্যেই লিখে ফেলি—'অসচেতনভাবে'! সব মাটি হয়ে যায় যখন খামখেয়ালবশত 'কষ্টকৃত বাক্‌ভঙ্গি' এনে ফেলি! ওদিকে যাকে বলে 'রানীর ইংরেজী' সেটা নাকি আমি রীতিমতো ভালো লিখি। যা দেখছি, এরপর কলকাতা গেলে শুনতে হবে : 'বাংলাটা কেতকী ভুলেই গেছে, আর ওর ইংরেজী বইগুলো মন্দ নয়, কেননা ওগুলো ওর বরই লিখে দেয়।'

কোনো লেখকের স্টাইল কোনো পাঠকের ভালো লাগা বা না লাগার ব্যাপারটা অনেকাংশে রুচির প্রশ্ন, তবু দু'-একটি কথা এখানে বলা যায়। ইংরেজী বইটা অ্যাকাডেমিক গন্ধে লেখা। তার পিছনে একটা সুধীজনমান্য মডেল আছে। বাংলা বইটা ঢের বেশি পরীক্ষামূলক : তার মধ্যে সৃষ্টিশীল লেখা তো আছেই প্রবন্ধধর্মী লেখাও আছে, স্প্যানিশ আর ইংরেজী থেকে অনুবাদ আছে, অনুবাদকর্মের অসুবিধা নিয়ে আলোচনা পর্যন্ত আছে। লাদিনো গানের অনুবাদের কাজ দিয়ে বইটা আরম্ভ হচ্ছে : ২৮-২৯ পৃষ্ঠায় ভাষান্তরের দুরূহতা সম্পর্কে মন্তব্যগুলি কি গৌরী

দেবী খেয়াল করেছেন? সবিনয়ে নিবেদন করি, কোনো পাঠকের যদি হাল আমলের পরীক্ষামূলক বাংলা লেখার চাইতে অ্যাকাডেমিক স্টাইলের ইংরেজী গদ্যের সঙ্গেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়, তা হলে তাঁর পক্ষে ইংরেজী বইটা পড়া সহজতর হতেই পারে। অনেক উচ্চশিক্ষিত বাঙালীরই বেশির ভাগ পড়াশোনা ইংরেজী ভাষায় : ইংরেজী গদ্য—সাংবাদিক বা বিদ্যাজাগতিক গদ্য—পড়তে তাঁরা অভ্যস্ত। আধুনিক বাংলা লেখা পড়তে তাঁদের অসুবিধা হয়। আবার এঁদেরই হাতে যদি কোনো অত্যাধুনিক ইংরেজী উপন্যাস বা কবিতার বই ধরিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তেমন লেখা পড়তে এঁদেরও অসুবিধা হতে পারে। যাঁরা বাংলাভাষার শরীরে যুগোপযোগী নতুন নতুন ছোতনা যুক্ত করার চেষ্টায় থাকেন, আধুনিক চিন্তার নানা স্রোত বাংলার প্রবাহে সঞ্চারিত ক'রে দেবার জন্যে পরিশ্রম করেন, তাঁদের লেখা পড়তে গেলে আরেকটু সহিষ্ণু তো হতেই হবে। আমাদের ভাষাটা রেডি-মেড জিনিস নয় ; পথ চলতে চলতেই সেটা আমরা তৈরি ক'রে নিচ্ছি। এর মধ্যে নিয়ত ভাঙা-গড়া চলেছে। তাই এর সবটাই আপনাদের চিরচেনা মাতৃভাষা হবে না ; এর মধ্যে নানা বিস্ময় থাকবেই। গৌরী দেবী আমার অস্বচ্ছন্দ শৈলীর যে-দৃষ্টান্তগুলি দিয়েছেন, সেখানে অনেকগুলি সমাসবদ্ধ শব্দের ভগ্নদশা ঘটেছে। জানি না এই ভুলগুলির উৎস তাঁরই পাণ্ডুলিপি, না 'চতুরঙ্গ'-এর মুদ্রণ। এই টুকরোগুলি সঠিক ছাপা অবস্থায় নিজ নিজ প্রসঙ্গে পুরো বাক্যের মধ্যে মানিয়ে যায় ব'লেই আমার ধারণা। আমি ওদের ওভাবে লিখে খুশী। নেপথ্যের অজ্ঞাতনামা কলকাকলি থেকে গার্হস্থ খুদকুঁড়োর আশায় বেরিয়ে আসে একটি কি দুটি ব্যক্তি-পাখি' বা 'বিলেতের বৃষ্টিবরফ যে জুতোর চামড়ার শ্রেণীশত্রু, এবং কালিই যে তার শ্রেণীমিত্র' আমার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত। plate tectonics ব্যাপারটার আভাস দিতে 'ভূত্বকের অস্থির থালাগুলির পরস্পর ধাক্কা-ধাক্কি'-কে অনেকে লাগসই এবং witty ব'লেই মনে করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বইটার পুরো পাণ্ডুলিপি যত্ন ক'রে পড়েছিলেন নাভানার তৎকালীন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বিরাম মুখোপাধ্যায়। ভাষার ব্যাপারে তাঁর মতো দিশারী কমই দেখেছি। কোনো শ্রীহীনতা তাঁর দৃষ্টি এড়াতো না। তাই গৌরী দেবীর আপত্তিকে খুব-একটা সিরিয়াসভাবে নিতে পারছি না।

এর পর সিরিয়াস বিষয়ে আসা যাক। গৌরী দেবীর ধারণা 'বইয়ের বিষয় রবীন্দ্রনাথ'। এখানে গোড়াতেই ভুল হলো। বাংলা বইটার টাইটলে যেমন, ইংরেজী বইটার সাবটাইটলে তেমনি দুজন লোকের নাম আছে। বইটার নাম আপনাদের পরিষ্কার ক'রেই ব'লে দিচ্ছে এর বিষয়টা কী : **Rabindranath Tagore and Victoria Ocampo**। অর্থাৎ এঁরা দুজনেই সমানভাবে এই বইয়ের বিষয়বস্তু, দুজনের উপরেই সমান ফোকাস্ পড়বে। এই কেন্দ্রিক ব্যাপারটা মনে না রাখলে নানা ভুল বোঝা-বুঝি তো ঘটতেই পারে।

গৌরী দেবীর এই ধারণাটা ঠিক নয় যে আলোচ্য বিষয়টা এত দিন কেবল বাঙালীদেরই ঔৎসুক্যের ব্যাপার ছিলো। তাঁর দৃষ্টি রবীন্দ্রকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে আর্জেন্টিনা ব'লে একটা জায়গা আছে এবং সেখানেও এই কাহিনীটা সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল বর্তমান। একজন প্রবাসী বাঙালী এন্‌জিনিয়রের মুখে শুনেছি, তিনি একবার একজন আর্জেন্টাইনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, যাঁর ধারণা ছিলো যে ভিক্তোরিয়া রবীন্দ্রনাথকে বিয়েই করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভিক্তোরিয়ার সেই পায়ের ধুলো নিয়ে শ্রদ্ধানিবেদনের ভঙ্গিটা গৌরী দেবীর মন কেড়েছে। তাঁকে মনে রাখতে অনুরোধ করছি যে এর মধ্যে কিন্তু গভীর আয়রনি আছে। বই প'ড়ে দূর দেশের 'দাম্পত্য-প্রথার তাৎপর্য' যিনি বুঝেছিলেন, তিনি কিন্তু তাঁর আপন দেশে নিজের স্বামীর সঙ্গে একেবারেই মানিয়ে চলতে পারেন নি, স্বামীর পায়ের

ধূলো নেওয়া তো দূরের কথা।

গৌরী দেবী আমার ইংরেজি বইটার শৈলীর প্রশংসা করলেও বইখানা খুঁটিয়ে পড়েছেন এমন মনে হয় না। মনে হয় কেবল পাতা উলটে গেছেন। এই বইটা আলোচনা করতে গিয়েও তিনি বাংলা বইটা থেকেই বেশ কিছু উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন। ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সামাজিক ও ব্যক্তিগত পটভূমিকা বাঙালীদের কাছে স্বল্পজ্ঞাত ব'লে আমি বিশেষ চেষ্টা করেছিলাম যাতে এই দ্বিতীয় বইটাতে ভিক্‌তোরিয়ার আর্জেন্টাইন স্বরূপ যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে ধরা পড়ে। দুটো বই লেখার মধ্যবর্তী সময়ে আমি অনেক নতুন বই পড়েছিলাম। অনেক নতুন দলিল আবিষ্কার করেছিলাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে বুয়েনোস আইরেসের 'লা নাসিয়ন' পত্রিকায় আমার ইংরেজী বইটার দীর্ঘ প্রশংসামূলক রিভিউ বেরিয়েছে; সেখানে সমালোচক স্বীকার করেছেন যে আমার বইটা প'ড়ে তিনি তাঁর দেশের মেয়ে ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোকে—বিশেষত তাঁর জীবনের আর্ত অস্পষ্ট দিকটাকে—অনেক বেশি ভালো ক'রে বুঝতে পেরেছেন। তাঁর বিচারে ওকাম্পোর নিজস্ব আত্মজীবনীর পর আমার ইংরেজী বইটাই এ যাবৎ প্রকাশিত একমাত্র বই যা 'সোলেদাদ সোনোরা'-র রচয়িত্রীর সূচনাপর্বকে কাছ থেকে এবং উজ্জ্বলভাবে চিনিয়ে দেয়। এই সমালোচক তার আগেই আমাকে চিঠিতে অনুরোধ করেছিলেন, আমিই যেন ভিক্‌তোরিয়ার সামগ্রিক জীবনী রচনার দায়িত্ব নিই।

গৌরী দেবীর সমালোচনায় কিন্তু আমার কাজের আর্জেন্টাইন দিকটার কোনো স্বীকৃতি নেই। বাংলা বইটা পড়ার পর ইংরেজী বইটাতে প্রবেশ ক'রে তার স্বাদ নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার সেই মেয়েটিকে কি তিনি আরেকটু অন্তরঙ্গভাবে চিনলেন? মনে তো হয় না। হয়তো চিনতে চানও না।

এ বইটা আমি দু'-দিকের জন্যই লিখেছি। কোনো-কিছু 'ফাঁস' করি নি; কোনো কথা 'চেপে যাওয়া'-ও আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। গৌরী দেবী যদি জানতেন, এই গল্পটা সম্বন্ধে আর্জেন্টাইনদের কতটা কৌতূহল। কতজন আমাকে বলেছেন, 'আচ্ছা, ওঁরা কি সত্যি পরস্পরকে ভালোবেসেছিলেন? আপনি কী মনে করেন? আপনি যা-কিছু খবর পাবেন, সব বইয়ে দেবেন, কিছু চাপবেন না কিন্তু, কেননা ওঁদের ভালোবাসা ঠিক কী ধরনের ছিলো তা আমরা জানতে চাই।' আর্জেন্টাইনদের এই জিজ্ঞাসার প্রতি গবেষক হিসাবে আমার একটা দায়িত্ব ছিলো। সেটা আমি এড়িয়ে যেতে চাই নি। এবং এখানে আপনাদের সবাইকেই একটি কথা মনে রাখতে অনুরোধ করি। বাঙালীরা যেমন মনে করেন বিদেশিনী বিজয়াই রবি-অনুরাগিণী হয়ে পড়েছিলেন, আর্জেন্টাইনরা তেমন মনে করেন যে বিদেশী কবিই তাঁদের দেশের মেয়েটির প্রেমে পড়েছিলেন।

আমার বিশেষ দুঃখ এই যে বিশ্বভারতী ও সাহিত্য অ্যাকাডেমি কর্তৃক অনুমোদিত ৪৭৭ পৃষ্ঠার এই অ্যাকাডেমিক বইটাতে আমার অনেক পরিশ্রমের ফসলকে তার ন্যায্য পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে পশ্চিম-বঙ্গের কিছু সীমাবদ্ধ দৃষ্টির পাঠক আদেখলের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন একটিমাত্র পৃষ্ঠার উপরে, লুব্ধ শিশু যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে মণ্ড-মিঠাইয়ের উপরে। আমি স্তম্ভিত যে মাননীয়া গৌরী আইয়ুবও এই কাজটি করেছেন। বস্তুত, কেবল একটি ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতেই তাঁর নিজস্ব সুরুচিবোধের তাড়নায় (বা যাঁরা তাঁর সুরুচিবোধের শরিক তাঁদেরও প্ররোচনায়) তিনি কলম ধরেছেন, নয়তো বৃহদায়তন বইটাতে আলোচিত আর কোনো ব্যাপারে তাঁর তেমন কোনো মতামত নেই।

এ কথা ঠিক নয় যে বুয়েনোস আইরেসে গিয়ে 'কাগজপত্র ঘেঁটে' তবেই আমি ঘটনাটি প্রথম 'আবিষ্কার' করি এবং এ কথা একেবারে ঠিক নয় যে ওটি আমি 'সোৎসাহে' পেশ করেছি। গৌরী দেবী লেখার পূর্বে কিছুটা অনুসন্ধান ক'রে নিলে পারতেন;

বিতর্কিত বিষয়ে লেখার আগে রিসার্চ বা হোমওয়ার্ক যাই বলুন বেশ দরকারী। অনুসন্ধিৎসুদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার ৯ : ৩ সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনাটি প'ড়ে নেন।

সংক্ষেপে আবারও বলি, আলোচ্য ঘটনাটির প্রতিবেদন বইয়ে না দিয়ে আমার উপায় ছিলো না। এর একটা ভাঙাচোরা রূপ আমি পাই আর্জেন্টিনায় যাবার আগেই অক্সফোর্ডে একজন আর্জেন্টাইনের মুখে। বুয়েনোস আইরেসের আর্কাইভ্‌সে পৌঁছে এই বিবৃতিটির খোঁজ পেতে আমাকে বিশেষ 'কাগজ-পত্র ঘাঁটতে' হয় নি। প্রথম দিনই, কাজ আরম্ভ করার আধ-ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্যারাগ্রাফটি পড়ে-ছিলাম। ফাইলটি লেখ্যাগারের রক্ষাকর্ত্রীরাই হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এর প্রতিবেদন আমি বইয়ে দিতে বাধ্য ছিলাম। 'চেপে গেলে' নিরপেক্ষ গবেষণার নিরিখে অন্যায় কাজ হতো। প্রথমত, ঘটনাটি যেহেতু গোপন নয়, মুখে মুখে ফেরে, তাই একদিন না একদিন সাতমুখ ঘুরে বিকৃততর অবস্থায় এটি নিশ্চয়ই ভারতে পৌঁছতো। তখন বিদ্বজ্জনরা আমাকে দোষ দিতেন, আমি কেন এ কথা জেনে-শুনেও চেপে গেছি; অত টাকা খরচ ক'রে আমাকে আর্জেন্টিনায় পাঠানো হয়ে-ছিলো সে কি রিসার্চের ফলাফল চেপে যাবার জন্যে? গবেষক হিসাবে আমার কর্তব্য ছিলো ভিক্‌তোরিয়ার নিজের বিবৃতিটুকু ঠিক ক'রে উদ্ধার করা। দ্বিতীয়ত, ওকাম্পোর জীবনীকার ডরিস মায়ার প্রশ্ন করেছেন, ভিক্‌তোরিয়ার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা কি শুধুই আধ্যাত্মিক ছিলো, না অন্য কিছুরও মিশাল তাতে ছিলো। গবেষক হিসাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমি বাধ্য ছিলাম।

ঘটনাটি আমি 'সোৎসাহে' পেশ করেছি, এটি আমার বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ। যাঁরা নিজেরা বইটা ঠাণ্ডা মাথায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়বেন, তাঁরা দেখবেন যে আমি শান্ত অ্যাকাডেমিক স্টাইলেই বিবরণ দিয়েছি, অন্য অনেক খবর দেবার পর তবেই। আমার ভাষায় কোথাও কোনো উৎসাহ বা সস্তা চটকদারি নেই। আমি যদি বলতাম, 'একটা ব্যাপার জানি, কিন্তু বলবো না', তা হলে আরও অশোভন হতো। আমি যেভাবে লিখেছি সেটাই আমার বিচারে শোভনতম ভঙ্গি।

দোহাই আপনাদের, 'ফাঁস' যা করবার তা করেছেন স্বয়ং ভিক্‌তোরিয়া। এবং ঘটনাটি অনায়াসে তাঁর ছাপা আত্মজীবনীতেই স্থান পেতে পারতো। স্থান না পাবার প্রকৃত কারণ ওখানে তাঁর জনৈক অনুগত শিষ্যার হস্তক্ষেপ পড়েছে, যিনি ভারতের গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর গুরুস্থানীয়ার প্রেমের কাহিনী-টাকে নিষ্কলঙ্ক ভারতপ্রেমের গোত্রভুক্ত করে রাখতে চান। ফরাসী খসড়াটাই আত্মজীবনী চতুর্থ খণ্ডের আসল আকর। এর কোনো স্প্যানিশ রূপ ভিক্‌তোরিয়া নিজে তৈরি করে গেছিলেন বলে মনে হয় না। খোঁজ নিয়ে যতদূর জেনেছি, এই খণ্ডটির স্প্যানিশ রূপের মধ্যে অনেক গোঁজামিল আছে। গোঁজামিল যে আছে, তা বইটা পড়লে এমনিতেই সন্দেহ হয়, এবং সে-কথা আমি আলোচনাও করেছি আমার বইয়ে।

আমার ধারণা, এবং অন্যরাও এ ধারণা সমর্থন করেন, যিনি এই খণ্ডটির স্প্যানিশ রূপ তৈরি করেছেন, তিনিই কাটছাঁট করেছেন। আমরা যাঁর কথা ভাবছি তিনিই যদি অনুবাদিকা হয়ে থাকেন, তা হলে বলতেই হয় যে তাঁকে আমার রবীন্দ্র-ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, মিরাল্‌রিও বলে কোনো বাড়ি নেই, রবীন্দ্রনাথ ভিক্‌তোরিয়ার বাপের বাড়ি ভিলা ওকাম্পোতেই উঠেছিলেন। ওখানকার ভারতীয় দূতাবাসকেও সে-রকম বোঝানো হয়েছে। ভারতীয়রা গেলে তাঁদের ভিলা ওকাম্পো ঘুরিয়ে দেখানো হয়, বলা হয় রবীন্দ্রনাথ ওখানে ছিলেন। লোকে তা বিশ্বাসও করে, বইপত্র না পড়েই। আপনারা সকলেই জানেন, এটা মিথ্যা কথা। আরেক প্রচার অনুসারে মিরাল্‌রিও ছিলো, কিন্তু এখন আর নেই, সন্ত্রাসবাদী বোমায়

তাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কথাও ভিত্তিহীন। মিরাল্‌রিও এখনও জলজ্যান্ত আছে—সেই বাড়ি, সেই দোতলার বারান্দা, সেই নদী, সেই বাগান, সেই 'তিপা' গাছ। আমি সেই বাড়ি স্বচক্ষে দেখেছি। গত বছর ওকাম্পোর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মিরাল্‌রিও-র কিছু আধুনিক রঙিন ফোটোগ্রাফ-সহ 'লা নাসিয়ন' পত্রিকা আমার বইটা সম্বন্ধে রবিবাসরীয় ম্যাগাজিনে 'কাভার স্টোরি' করে। জানি না তার পরেও মিরাল্‌রিওর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রচার চলছে কিনা। এই প্রচারের কারণ জানি। ভিলা ওকাম্পোর জন্য অর্থসাহায্যের প্রয়োজনীয়তাই এর আসল কারণ। মিরাল্‌রিও নেই বা কখনো ছিলো না—এ কথা বললে ভিলা ওকাম্পোই ওখানকার একমাত্র রবিতীর্থ হয়ে দাঁড়ায়, এবং রবীন্দ্রনাথের নাম করে ভারত বা অন্য সূত্র থেকে পাওয়া অর্থসাহায্য কেবল ওখানেই চ্যানেল করে দেওয়া যায়। এই পলিটিক্‌স্‌টুকু বুঝতে আপনাদের নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে না।

গৌরী দেবীর ঐ যে ধারণা—'বিধিনির্দিষ্ট' দায়িত্বে নিজেকে দেখতে পেয়ে আমি 'পরম সন্তোষের সঙ্গে' খবরটি পেশ করেছি, এটি আমার বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ। তাঁর দৃষ্টি এখানে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় টেক্সটের পাঠও তাঁর ঠিক হয় নি। তিনি লিখেছেন : '......কেতকী পরম সন্তোষের সঙ্গে জানান যে রবীন্দ্রনাথের ওই মৃদু সন্তর্পণ স্পর্শটুকু ভিক্‌তোরিয়া প্রত্যাখ্যান তো করেনই নি, বরং 'motherly tenderness'-এর বশে বৃদ্ধের ভুল ভাঙাবার কোনো চেষ্টাও করেন নি।' কিন্তু বইয়ের ২৭২-২৭৪ পৃষ্ঠায় আমার বিবৃতি ঠিক ওরকম নয়। পাঠকরা নিজেরা প'ড়ে দেখতে পারেন। ওখানে কোনো 'motherly tenderness'-এর কথা নেই। 'maternal tenderness' শব্দদুটি আছে এই ঘটনার বিবৃতির আগে, ২৬৭ পৃষ্ঠায়। গৌরী দেবী আগেকার কথা পরবর্তী অংশে 'সুপারইম্‌পোজ' করেছেন।

২৭৪ পৃষ্ঠায় আমার বক্তব্যের ব্যঞ্জনা মোটেও এ নয় যে কেবল এই ঘটনাটির সূত্রে ভিক্‌তোরিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। ওরকম কোনো ছেঁদো কথা আমি বলি নি। গৌরী দেবী আমার ইংরেজির প্রশংসা করলেও তার নুয়ান্স ধরতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। এই ২৭৪ পৃষ্ঠার বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরেকবার ঐ প্রাক্তন ২৬৭ পৃষ্ঠার তিনটি বক্তব্যকে টেনে এনে একটা জট পাকিয়েছেন। পাঠকরা নিজেরা দেখে নেবেন। পাঠঘটিত এই দোষকে সমালোচনায় বলা হয় **conflation**। এর ফলে আমার বক্তব্যকে বিকৃত ক'রে ফেলা হয়েছে।

এ কথা ঠিকই যে মিরাল্‌রিওতে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ মনে করতে পেরেছিলেন যে নারীর প্রেমের মূল্যবান উপহার তিনি পেয়েছেন। কিন্তু তিনি যদি প্রথম দিকের পরিকল্পনা অনুযায়ী ওখানে সপ্তাহখানেক থেকে চলে যেতেন, তা হলে তাঁর জীবনে ভিক্‌তোরিয়ার প্রভাব কতটা গভীর হতো তা আমরা বলতে পারি না। দুটো মাস থাকলেন, স্মৃতির তহবিলে আরও কিছু অবিস্মরণীয় মুহূর্তের দান জমা পড়লো, একত্র ভ্রমণ কবিতাপাঠ আলোচনা খাওয়াদাওয়া মান-অভিমান পরিহাস-বিনিময়, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি চিঠি লেখালেখি—এইসব প্রাত্যহিকতার মাধ্যমে দুজনে আরও কাছাকাছি এলেন ; তবেই না বিদেশিনী মেয়েটি ক্রমশ 'বিজয়া' হয়ে উঠলেন। ছোট্ট ঘটনাটির কোনো প্রতিবেদন যদি না পাওয়া যেতো, তা হলেও 'গভীর সম্পর্ক' সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করতাম না, কিন্তু খবরটুকু পাওয়ায় বোঝা গেলো যে মেয়েটির প্রতি কবি একটি সামগ্রিক আকর্ষণই অনুভব করেছিলেন। এটা একটা **confirmation**। এখানেই তার গুরুত্ব। ঐ খবরটুকু আমি যদি না দিতাম, তা হলে কিছু লোক এখনও বলে যেতেন, বিজয়ার প্রতি

কবির প্রেম কেবলই আধ্যাত্মিক ছিলো, তার বেশি কিছু ছিলো না। এখন আর তাঁরা সে-কথা বলতে পারছেন না।

আমার ধারণা, সামগ্রিক প্রেমানুভূতি থেকেই উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা জন্ম নেয় ; তাই ঐ খবরটুকু দিতে পেরে গবেষক হিসাবে আমি দায়িত্বপালন করেছি। কিন্তু ওটিকে আমি 'প্রায় অপরিহার্য' মনে করেছি, বা 'এই সোনার চাবি আচমকা হাতে পেয়ে গিয়ে উল্লসিত' হয়ে উঠেছি—এভাবে বললে আমার বইয়ের বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়। আমি কোথাও একে সোনার চাবি বলি নি। তা আচমকা হাতে পাই নি। পড়ার আগে কানে শুনেছিলাম। আমার ভাষায় কোথাও উল্লাসের সুর লাগে নি। তা সর্বত্রই শালীন ও সংযত থেকেছে।

কেন যে এই প্রতিবেদন গৌরী দেবীর ভাষায় 'অত্যন্তই মর্মাহত করেছে অনেককে', তা আমার কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয়, তবে আন্দাজ করছি যাঁরা মর্মাহত হয়েছেন তাঁদের আর আমার মধ্যে বিশ্ববীক্ষার একটা দুস্তর ব্যবধান বর্তমান। তবে এখানে আমার বক্তব্য : মর্মাহত হবার অধিকার তাঁদের নেই। এই অধিকার তাঁরা কোথা থেকে পাচ্ছেন ? কে সেটা দিয়েছে ?

না, গৌরী দেবী, কবির ঐ হাত বাড়িয়ে দেওয়াটুকুকে আমি তাঁর 'মানুষী দুর্বলতা' ব'লে মনে করি না। ওটা আমার কাছে তাঁর সবলতারই চিহ্ন, তাঁর পৌরুষের মাধুর্যের অভিজ্ঞান। এখানেই আমাদের বিশ্ববীক্ষার ফারাক। আমার কাছে ওটি একটি মধুর মুহূর্ত। ওখানে কোনো গ্লানি নেই, কোনো দুর্বলতা নেই, কোনো দৈন্য নেই। রবীন্দ্রনাথ কোনো অন্যায় করেন নি। ঘটনার সময়ে তিনি নাবালক নন। মহিলাটিও নাবালিকা ছিলেন না। ওটি নিয়ে কারও লজ্জা পাবার কারণ তো নেইই, লজ্জা পাবার অধিকারও নেই। যাঁরা লজ্জা পাচ্ছেন, তাঁরা কোন্‌ সাহসে লজ্জা পাচ্ছেন ? তাঁদের কুণ্ঠা তাঁদের স্পর্ধার নামান্তর। তাঁরা কি ঐ মৃত মহাকবির 'নৈতিক অভিভাবক' যে শরমে ম'রে যাচ্ছেন ? তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও তাঁরা তাঁর 'মরাল গার্জেন' হয়ে থাকতে চান ? এতে যে তাঁর প্রতিই অশ্রদ্ধা ও অসৌজন্য দেখানো হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাবক হবার এই মহালোভ তাঁদের ত্যাগ করা উচিত। তিনি আপনাদের বালক সন্তান নন, সম্পত্তি নন। তাঁকে আঁচলে বেঁধে রাখবেন না। তাঁকে যেতে দিন।

ঐ ঘটনার সমান্তরালে গৌরী দেবী তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে যে-ঘটনাটির প্রতিবেদন দিয়েছেন, সেটি প'ড়ে হতবাক্‌ হলাম। এ থেকে তাঁর মনের কিছুটা আন্দাজ পাচ্ছি। তাঁর কাছে প্রেমের শারীরিক প্রকাশ আর টয়লেটে যাওয়া তা হলে সমগোত্রীয় ?

আমি জানি না গৌরী দেবীর কাছে শরীর জিনিসটা এত নোংরা কেন। একজন অসহায় বৃদ্ধকে এক নিমেষ বেডপ্যানে বসা অবস্থায় দেখে ফেলাতে তাঁর মনের মধ্যে এত তীব্র একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে কেন ? এটা কী-এমন মনে রাখবার মতো ঘটনা ? এতে ক'রে বৃদ্ধটির প্রতি শ্রদ্ধা হারাবে কেন ? মানুষ যে কত অসহায়, তা কি গৌরী দেবী সেদিন প্রথম বুঝলেন ? তার আগে বোঝেন নি ? অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাদের যে-কাউকে তো ডাক্তার-নার্সের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাঁরা তো নিত্যই আমাদের অসহায়তার দর্শক। শরীর সম্পর্কে গ্লানিবোধ থাকলে সেবা দেওয়াই বা যাবে কিভাবে, আর নেওয়াই বা যাবে কিভাবে ?

তুলনা দিয়ে বোঝাতে পারি, আর্কাইভ্‌সে ব'সে ঐ প্যারাগ্রাফটি পড়ার অভিজ্ঞতা আমার কাছে কী ধরনের। যেন আপন মনে একা-একা কোনো আর্ট গ্যালারিতে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ একটা নির্জন ঘরের কোণে সুন্দর একটা ছবির মুখোমুখি হয়ে গেলাম। লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে ষোড়শ শতাব্দীর

ইতালীয় চিত্রশিল্পী Bronzino-র একটি বিখ্যাত ছবি আছে, যেটি চিত্রজগতে 'An Allegory of Venus and Cupid' এই নামে পরিচিত। সেখানে কিশোর কিউপিড প্রেমের দেবীকে চুমো খাচ্ছে। তার বাঁ হাত দেবীর মাথা আর ডান হাত দেবীর বাম স্তনকে ধ'রে আছে। দেবী চুম্বনরত কিশোর মদনকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করছেন; তাঁর ডান হাতে একটি বাণ। হ্যাঁ, আমার কাছে ওকাম্পোর লেখা লাইন-গুলির মুখোমুখি হওয়া আর এইরকম কোনো ছবির সামনাসামনি এসে যাওয়ার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। উভয় ক্ষেত্রেই রসগ্রাহী হয়ে উঠতে হলে দেহবিষয়ক পাপবোধের ঠুলিটাকে বাইরে খুলে রেখে আসতে হবে।

গৌরী দেবী বিনয় ক'রে নিজেকে 'ছোটো মাপের মানুষ' ব'লে চিহ্নিত করেছেন। তা না ক'রে তাঁকে বরং ভেবে দেখতে বলি, এ ব্যাপারে তিনি নিজে নন, তাঁর **দৃষ্টিটা** ছোট মাপের হয়ে যাচ্ছে না তো? হয়তো দৃষ্টিটাকে বড় করতে পারলে দেখার বাধাটা কেটে যাবে। আর যত দিন তা করতে অসুবিধা হচ্ছে, তত দিন না-হয় ও পাতাটা বাদ দিয়ে চ'লে যান। ওটা পড়তে হলে দৃষ্টির একটা প্রাপ্তবয়স্কতা লাগবে।

রবীন্দ্রনাথকে আমি অসম্ভব শ্রদ্ধা করি ব'লেই মনে করি যে ঘটনাটুকু চেপে গেলে তাঁর প্রতি অভিভাবকত্ব ফলানো হতো, অতএব অমার্জনীয় অপরাধ হতো। প্রতিবেদনটুকু বইয়ে রেখে আমি একজন সিরিয়াস গবেষকের দায়িত্ব পালন করেছিমাত্র। এবং আপনাদের মনে রাখতে অনুরোধ করি, যিনি বা যাঁরা ভিক্টোরিয়ার প্রকাশিত আত্মজীবনীর চতুর্থ খণ্ড থেকে উক্ত অংশটুকু (এবং এল্‌ম্‌হার্স্ট'কে নিয়ে তুলনীয় অংশটুকু) বাদ দিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন। তাঁরা ভিক্টোরিয়াকে সেন্সর ক'রে তাঁর উপরে গার্জেনি করেছেন। এই কাঁচির কাজের কোনো দরকারই ছিলো না, কেননা গ্রন্থপ্রকাশের সময়ে আলোচ্য তিনজন ব্যক্তিই মৃত। আমার বিবেচনায় এই সেন্সরশিপ ধৃষ্টতা। এর ফলে এবং অন্যান্য সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপের ফলে চতুর্থ খণ্ডটি ক্ষতিগ্রস্ত, তৃতীয় বা পঞ্চম খণ্ডের মতো উজ্জ্বল নয়। আলোচ্য অংশটুকু এবং প্রাসঙ্গিক আরও কিছু লাইন ফরাসী ফাইলটি থেকে উদ্ধার ক'রে লেখিকা ভিক্টোরিয়ার প্রতিও আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। আমার মতে এই উদ্ধারগুলি ঐ ত্রিকোণ বন্ধুত্বের নিহিত আলো-ছায়াকে বুঝতে মূল্যবান সাহায্য করে।

শালীনতা আর অশালীনতার মধ্যে তফাৎ আমিও ক'রে থাকি। সাল্‌মান রুশ্‌দির 'শয়তানী পদাবলী'-র বিরুদ্ধে আমিও কলম ধরেছিলাম। কিন্তু আমার এ বইয়ে কোনো শালীনতাহানি, কোনো দায়িত্বচ্যুতি ঘটেছে, এ কথা মানতে পারি না। প্রসঙ্গত জানাই প্রকাশের আগে বইটার পুরো পাণ্ডুলিপি ছজন বিদগ্ধ ব্যক্তি পড়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে একজন প্রকাশকের তরফে। ছজনের একজনও শালীনতাহানির অভিযোগ আনেন নি।

আসলে এ ধরনের গবেষণা কোনো 'divine quest'-ও নয়, কোনো 'unholy curiosity'-ও নয়। রবীন্দ্রনাথ, ওকাম্পো, এল্‌ম্‌হার্স্ট—এঁরা কেউই অশরীরী দেবতা নন। প্রত্যেকেই মানুষ। এঁদের নিয়ে জীবনীসংক্রান্ত গবেষণা কোনো দেবতার ছিদ্রান্বেষণ নয়, মানুষকে মানুষের নিকটেই দেখতে শেখা। গুরুবাদী সংস্কৃতিতে এই শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। মহৎ ব্যক্তিদের মানুষ ব'লে চিনতে-জানতে শিখলে তবেই তাঁদের প্রকৃত মানবিক মহত্ত্বের আদল পাওয়া যায় এবং নিজেদের জীবনে তাঁদের প্রাসঙ্গিক ক'রে তোলা যায়। নয়তো উঁচু আসনে বসিয়ে এঁদের কেবল পুজো ক'রে গেলে এঁরা দূরেই রয়ে যান। তাঁদের কাছ থেকে যা শিখতে পারতাম, তা আর শেখা হয়ে ওঠে না। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই যাঁরা বড় তাদের কাছে টানতে শিখতে হয়।

প্রবন্ধের একেবারে শেষে গৌরী দেবীর যে-

বক্তব্য—রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কীর্তির চেয়েও রবীন্দ্রনাথ নামে মানুষটা এই ছন্নছাড়া যুগকে অনেক বড় আশ্রয় দিতে পারে—এর তাৎপর্য কিন্তু বুঝলাম না। রবীন্দ্রনাথেরই একটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি এখানে প্রচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলতে চেয়েছিলেন যে তাজমহলের চেয়ে প্রেমিক শাহ জাহানের হৃদয় মহত্তর। কিন্তু এখানে সেই উক্তির প্রতিধ্বনি করা কি অর্থবহ? রবীন্দ্রনাথ মানুষটা আর নেই। আমরা যারা তাঁর উত্তরসূরি, তারা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জানি নি। যাঁরা তাঁকে ওভাবে জানতেন, তাঁরা যে একে-একে গত হবেন—এটাই জগতের নিয়ম। তাই উত্তরসূরিরা তাঁকে জানবেন তাঁর কীর্তির মাধ্যমেই: আর তো কোনো পথ নেই। তাঁর কীর্তিই আমাদের সম্পদ, এবং এ জিনিস তো কোনো গোষ্ঠীর, কোনো প্রতিষ্ঠানের, কোনো দেশের একলার সম্পত্তি নয়। বিশ্বের সুধীজনের ও রসিকজনের তাতে অধিকার রয়েছে। দ্বার রুধলে চলবে না। তিনি এত বড় যে যুগ-যুগ ধ'রে দেশে-বিদেশে তাঁকে নিয়ে গবেষণা হবে। সেই অনাগত দিনের গবেষকরা আমার চেয়ে কম অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা দাবি করবেন না। হয়তো আজকে আমি তাঁদের হয়েই লড়ছি। আর আমার এই 'জবাব' গৌরী দেবীর উদ্দেশে কোনো ব্যক্তিগত সমালোচনা নয়। আমি কেবল বলতে চাইছি তাঁর তর্ক আমার কাছে গ্রাহ্য নয়, বাংলা বইটার বেলায় সাহিত্যিক কারণে, আর ইংরেজী বইটার বেলায় অ্যাকাডেমিক কারণে।

পরিশেষে জানাই, ইংরেজী বইখানার ২১ পৃষ্ঠায় অন্নপূর্ণা তরখড়ের সঙ্গে কবির পরিচয়ের স্থান অনবধানতাবশত দেওয়া হয়েছে আহমেদাবাদ। ওটা হবে বোম্বাই। ভুলটা আমার চোখে পড়েছে বই বেরিয়ে যাবার পরে। এই ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত। বইটার কল্পিত গলদ নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরা যদি এইরকম আরও দু'-একটা সত্যিকারের ভুল বার করতে পারতেন, তা হলে তা সম্পূর্ণ বৈধ সমালোচনা হতো, এবং আমিও উপকৃত হতাম।

কেতকী কুশারী ডাইসনের জন্ম ১৯৪০ সালে। কলকাতা এবং অক্সফোর্ডের স্নাতক শ্রীমতী ডাইসন ডক্টরেট করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বর্তমানে তিনি বসবাস করেন অক্সফোর্ডের কাছেই কিডলিংটনে। ১৯৮৬-৮৭ সালে গ্রেটার লন্ডন আর্টস-এর স্পনসরশিপে লনডন বরো অফ্‌ রেডব্রিজ এডুকেশনাল সার্ভিসের অধীনে শ্রীমতী ডাইসন ছিলেন রাইটার-ইন রেসিডেন্স। বাঙলা এবং ইংরাজি মিলিয়ে অনেকগুলি বই তিনি লিখেছেন। প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, অনুবাদ, গবেষণামূলক রচনা ইত্যাদি সবরকম লেখাতেই শ্রীমতী ডাইসনের দক্ষতা সুপরিচিত। "রবীন্দ্রনাথ ও ভিকটোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে" গ্রন্থটির জন্য ১৯৮৬ সালে তিনি লাভ করেন প্রফুল্লকুমার সরকার স্মারক আনন্দ পুরস্কার।

এক মহীয়সী বাঙালি রমণীর জীবন-আলেখ্য

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

এদেশে ব্রিটিশ শাসন তথা ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন আধুনিকতার যে আলোক-ঝরনার ধারা নিয়ে আসে তাতে সাগ্রহে অবগাহন করেছিলেন হিন্দুরাই, মুসলিমেরা এ ব্যাপারে ছিলেন স্পষ্টতই উদাসীন। এজন্যই উনিশ শতকের বাঙালি জীবনে বৌদ্ধিক জাগরণের যে জোয়ার আসে, তার আনুকূল্য লাভ করে বাঙালি হিন্দু অল্পকালের মধ্যেই পৌঁছে যান এক বিশেষ অগ্রবর্তী অবস্থানে। পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় সব দিক থেকেই যথেষ্ট পিছিয়ে পড়েন এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকেই তাঁদের এই পশ্চাদ্‌গামিতার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তৎকালীন বাঙলায় শিক্ষাবিস্তার ও সাংস্কৃতিক প্রবাহে, সমাজসংস্কারের কর্মকাণ্ড তথা রাজনৈতিক আন্দোলনে। কেন বাঙালি মুসলমান ইংরেজ শাসনের প্রগতিশীল ফলের আস্বাদনে বিমুখ হয়েছিলেন সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন এ কালের কয়েকজন (মূলত বাংলাদেশের) বিশিষ্ট গবেষক ; বর্তমান গ্রন্থকারও তাঁর বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে একটি তথ্যসমৃদ্ধ, বিদগ্ধ আলোচনা উপহার দিয়েছেন। এইসব গবেষণাভিত্তিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি ছুয়েকটি সাধারণ কথা সম্ভবত বলা যেতে পারে। যেমন, মূলত মুসলিম শাসকদের উৎখাত করেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। সঙ্গত কারণেই তাই মুসলিম সম্প্রদায় এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অভ্যুদয়কে ভালো চোখে দেখতে পারেন নি। এই অবস্থায় ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁরা অনাগ্রহ বোধ করবেন, এটাই ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক। অতএব, সচেতনভাবেই হোক, অথবা অচেতনভাবেই হোক, গোড়ার দিকে মুসলিম জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনব্যবস্থার প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন এক ধরনের রাজনৈতিক কারণে। দ্বিতীয়ত, এ ব্যাপারে অবদান ছিল এক বিশেষ সাংস্কৃতিক কারণেরও অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এদেশে ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডরূপে দেখা দিতে শুরু করে তখন বঙ্গদেশে ব্যাপক প্রচলন ছিল ফারসি ভাষার। সংস্কৃতের মতোই ফারসি ভাষা শুধু যে সাহিত্যে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ ছিল তাই নয়, ব্যবহারিক প্রচলনের ক্ষেত্রে এই ভাষা সংস্কৃতের তুলনায় ছিল অনেক এগিয়ে। অর্থাৎ, সে সময় সরকারি কাজে, কর্মে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফারসি ভাষার ছিল বহুল ব্যবহার। সঙ্গত কারণেই তাই বাঙালি মুসলমানের প্রভূত অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল ফারসি ভাষার প্রতি এবং এই ভাষাকে কেন্দ্র করে অন্তত উচ্চবিত্ত মুসলিমদের মধ্যে সযত্নে লালিত হয়েছিল এক ধরনের সাংস্কৃতিক আভিজাত্য। এই পরিস্থিতিতে বাঙালি মুসলমান স্বাভাবিকভাবেই নিস্পৃহ বোধ করেন ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে। তৃতীয় কারণটি ছিল একান্তই সমাজতাত্ত্বিক। বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজ মুসলিম সমাজের তুলনায় অনেক বেশি প্রাচীন বলে ইংরেজ আগমনের বহু আগে থেকেই তার সামাজিক গড়ন যথেষ্ট সুবিন্যস্ত ছিল। আবার চিরাগত বর্ণপ্রথার প্রভাবে এই সমাজের মধ্যস্তরে সক্রিয় ছিল নানা ধরনের পেশা ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি শ্রেণী। অর্থাৎ বাঙালি হিন্দু সমাজ ছোটো বড়ো কারিগর, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর কর্ম-প্রবাহে চঞ্চল ছিল দীর্ঘকাল ধরে। তাই এদেশে ইংরেজ শাসনের যখন গোড়াপত্তন হয়, তখন হিন্দু সমাজে, বিশেষত বাঙালি হিন্দু সমাজে এক ধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় তৈরি হয়েই ছিল এবং যে মুহূর্তে বিদেশী শাসক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচলন করে, সেই মুহূর্তে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাগ্রহে তাকে আত্মস্থ করে নিজেদের অগ্রগমনের পথ প্রশস্ত করে ফেলে। বাঙালি মুসলিম সমাজে যে এ জিনিস সম্ভব হয় নি, তার কারণ ইংরেজের আগমনকালে এই সমাজে কার্যত কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না, সে সময় এই সমাজে মূলত ছিল দুটি শ্রেণী—একদিকে বিত্তশালী ভূস্বামীর দল এবং অন্যদিকে বিত্তহীন কৃষিশ্রমজীবী শ্রেণী। এই দ্বিধাবিভক্ত সমাজের উচ্চ শ্রেণী ইংরেজি শিক্ষাকে তার আভিজাত্যবিরোধী রূপে গণ্য করেছিল আর নিম্ন শ্রেণীর এই শিক্ষাগ্রহণের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না আদৌই। প্রধানত এইসব কারণেই উনিশ-শতকীয় বাঙালি চিন্তা ও কর্মের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের কোনো বিশিষ্ট স্থান নেই।

তবে বাঙালি মুসলিম সমাজের এই অনগ্রসরতা দূরীকরণে কতিপয় অনন্য ব্যক্তিত্বের অসামান্য অবদান অবশ্যই উপেক্ষা করা যায় না। যেমন, বাঙলার মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলার ব্যাপারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলি, মুসলিম সমাজে বাঙলা সাহিত্যসাধনার গৌরবময় সূচনা করেছিলেন মীর মশাররফ হোসেন এবং শিক্ষাবিস্তারে নানাবিধ সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন দেলওয়ার হোসেন আহমদ, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, আবদুল আজিজ প্রমুখ বিশিষ্ট চিন্তাশীল কর্মযোগী। এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যিনি বাঙালি মুসলিম সমাজকে আধুনিক, আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর বহুমুখী কর্মোদ্যোগের সাযুজ্যে, আশ্চর্যের কথা এই যে, তিনি ছিলেন একজন নারী এবং এই অবিস্মরণীয়া রমণীর নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত হিসাবে যিনি অক্ষয় স্থান লাভ করেছেন একালের বাঙালির ইতিহাসে।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন দীর্ঘজীবনের অধিকারিণী ছিলেন না। তাঁর জন্ম ১৮৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং মৃত্যু ১৯৩২-এর ডিসেম্বর মাসেই। বাহান্ন বছরের এই স্বল্পকালের মধ্যে উনত্রিশটি বছর তাঁর কেটেছিল প্রথমে বিদ্যালয়ে এবং পরে স্বামিগৃহের সংসারজীবনে, ১৯০৯ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন বৃহত্তর সমাজ-জীবনের কর্মধারায়। অর্থাৎ, রোকেয়া হোসেনের কর্ম-জীবনের পরিধি ছিল মাত্র তেইশ বছর। কিন্তু এই তেইশ বছরেই পরিপার্শ্বের সকল প্রতিকূলতার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে তিনি যে অসামান্য কীর্তি স্থাপন করেছিলেন, এদেশের ইতিহাসে বোধ করি তার কোনো তুলনা নেই। পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার বিস্তার ছিল তাঁর প্রথম কীর্তি। ১৯১১ সালে মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে তিনি কলকাতা নগরীতে প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় যা পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যে এক পরিণত রূপ লাভ করে এবং আজ যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বালিকা বিদ্যালয়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে রোকেয়া তাঁর সর্বস্ব পণ করেছিলেন এবং কোনো বাধাই তাঁকে টলাতে পারে নি। অথচ তিনি নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ খেতাবধারী ছিলেন না, তিনি যা কিছু শিক্ষা লাভ করেছিলেন সবই ব্যক্তিগত প্রয়াস ও অনানুষ্ঠানিক স্তরে। তথাপি মুসলিম নারীজাগরণের এক আলোকস্তম্ভ তাঁর পক্ষে নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল শুধু অধ্যবসায় ও

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, জীবন ও সাহিত্য—মুহম্মদ শামসুল আলম। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। এক শত টাকা।

ঐকান্তিকতাকে সম্বল করে এবং এখানেই তাঁর অনন্যতা।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন শুধু স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারেই আত্মনিয়োগ করেন নি, বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন নারী ও পুরুষের সমানাধিকারে এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তথা আত্মনির্ভরতায়। এই বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে ১৯১৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি যা ছিল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অসামান্য কীর্তি। এই সংগঠনের মাধ্যমে নারীকল্যাণের এক ব্যাপক কর্মসূচি রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি জীবনের বাকি ষোল বছর ধরে। একই সঙ্গে নিখিল ভারত মহিলা সমিতির এক সক্রিয় সদস্য হিসাবে নারীসমাজের অগ্রগতিতে ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। এবংবিধ কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তৃতীয় যে ক্ষেত্রে রোকেয়া সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তা হল সাহিত্যচর্চা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। কিন্তু নিজের অবিচল অধ্যবসায়ে তিনি ইংরেজি ও বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর প্রখর ধীশক্তি ও কল্পনাশক্তি। ফলে তাঁর শক্তিশালী লেখনী সচল ছিল তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। তিনি পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, কয়েকটি ছোটগল্প, রসরচনা আর কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন। এছাড়া তাঁর লিখিত পত্রাবলী বাঙলা পত্র-সাহিত্যের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। দীর্ঘ জীবন লাভ করলে তাঁর সাহিত্যকৃতি অবশ্যই অনেক পুষ্ট ও পরিণত হয়ে উঠত।

এই মহীয়সী রমণীর ঘটনাবহুল জীবনই বর্তমান গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। লেখক মুহম্মদ সামসুল আলম গভীর যত্ন ও নিষ্ঠা নিয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবন ও সাধনার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর এই বিবরণে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। প্রথম অধ্যায়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিবরণ প্রসঙ্গে উনিশ-শতকীয় বাঙলার নবজাগরণ এবং এই প্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজ তথা নারীসমাজের অবস্থান বিষয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা যেমনই তথ্যনির্ভর, তেমনই উচ্চমানের বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। পরিশিষ্টে তিনি যে তথ্য সংযোজন করেছেন তার মূল্যও কম নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা হল এই যে বইটি মঞ্জুরী কমিশনের আর্থিক আনুকূল্যে দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত এক নিবিড় গবেষণার ফসল হয়েও এক অতীব প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ, তথাকথিত অ্যাকাডেমিক গবেষণার কঠিন বৈদগ্ধ্যে ভারাক্রান্ত নয়। এপার বাঙলায় যাঁরা অ্যাকাডেমিক গবেষণায় রত তাঁরা মুহম্মদ সামসুল আলমের এই সহজিয়া সাধনার পথ অনুসরণ করলে ভালো হয়।

মেঘনাদবধ কাব্যবিষয়ে ভিন্নধারার আলোচনা

পবিত্র সরকার

ডক্টর সুধীন্দ্র দেবনাথের "মেঘনাদবধ কাব্য : কাব্য-কায়া ও কবিকর্ম" বইটি বাঙলা ভাষায় সমালোচনার চেনা বইগুলি থেকে এমনই এক স্বভাবের দূরত্ব তৈরি করেছে যে, এটি হাতে নিয়ে মনে হয় এখানে এ সময় এমন একটি বই লিখিত ও প্রকাশিত হল কী করে? হল যে আদৌ, এতেই আমরা অজস্র-পরিমাণ 'গবেষণা'নামক আবর্জনাস্তূপের দ্বারা নিমজ্জিত হতে-হতে একটুখানি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নিতে পারি; বলতে পারি যে এমন একটি গবেষণাকর্ম

মেঘনাদবধ কাব্য : কাব্যকায়া ও কবিকর্ম : সুধীন্দ্র দেবনাথ, মণ্ডল অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা-৯। পঁয়তাল্লিশ টাকা।

সম্পাদিত হল যখন, তখন হয়তো কোথাও টিকে আছে ক্ষীণপ্রাণ অ্যাকাডেমিক মূল্যবোধ, উদ্দেশ্যের মৌলিকতা ও পরিশ্রমের সততা। সব এখনও হারায় নি। ড. দেবনাথের এ বই বইয়ের কনজিউমারদের জন্য, বাজারি সমালোচনাগ্রন্থের ক্রেতাদের জন্য, লেখা হয় নি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা অনার্স বা এম.এ. বৈতরণী-উত্তরণ-অভীপ্সু ছাত্রছাত্রীরা এর দিকে হয়তো ফিরেও তাকাবে না, আমরা অধ্যাপকেরাও এর মলাটটির সঙ্গে পরিচিত হতে চাইব কি না সন্দেহ। তবু এ বই লিখিত ও প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের গবেষণার মর্যাদা বেড়েছে। এর পরিকল্পনার জন্য ড. দেবনাথ এবং অনুমোদন-উপদেশনার জন্য প্রয়াত ড. জীবেন্দ্র সিংহরায়—দুজনের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

পশ্চিমে এই শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে একদিকে রুশ আঙ্গিকবাদীদের চেষ্টায় এবং পরে প্রাহা ভাষাবিজ্ঞান সমিতির কাজকর্মে শৈলীবিজ্ঞান বা স্টাইলিস্টিকসের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি-প্রকরণ গড়ে ওঠে, অন্যদিকে জার্মান লিও স্পিট্‌সারও হয়তো কিছুটা স্বাধীনভাবে যাকে 'মনস্তাত্ত্বিক শৈলীবিজ্ঞান' বলা যায় তার একটি তত্ত্বকাঠামো প্রায় পাশাপাশি খাড়া করতে থাকেন। তার পরে শৈলীবিজ্ঞানের নানামুখী বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু আমাদের দেশে স্টাইল বিষয়ক আলোচনায় যাদের আমরা বেশি উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি সেই মিডলটন মারি বা এফ. এল. লুকাস বা আর্থার কুইলার-কুচদের শৈলী-সংক্রান্ত আলোচনা মূলত আদর্শ রীতি ভিত্তিক, বা prescriptive। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন একটা ভদ্র বা ভালো রীতি আছে, সকলের সেই রীতি বা শৈলীকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু আঙ্গিকবাদী বা প্রাহাগোষ্ঠী, কিংবা স্পিট্‌সারীয় আধুনিক শৈলীবিজ্ঞান মূলত descriptive। তা শৈলীর ভালোমন্দ বিষয়ে—বা একটি শৈলীকে অন্য সব শৈলীর চেয়ে ভালো গণ্য করার বিষয়ে—উৎসাহী নয়। তাতে লেখকের শৈলী যা আছে তারই ঔচিত্য ও স্বাভাবিকত্ব মেনে নিয়ে তার লক্ষণগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়।

শৈলীর এই লক্ষণগুলিকে কয়েকটি খাতে ভাগ করে দেখা হয়—যেমন লেখকের ধ্বনিসজ্জা ও ধ্বনি-বিন্যাসের লক্ষণ; তাঁর শব্দনির্মাণ ও শব্দনির্বাচন, বিশেষ-বিশেষ শব্দের প্রতি তাঁর ঝোঁক বা দুর্বলতা; তাঁর বাক্যবন্ধ-গঠনের বৈশিষ্ট্য বা শব্দযোজনার (collocation) চরিত্র; তাঁর শব্দ ও অন্যান্য প্রয়োগ-কর্মে অর্থন্যাসের জটিলতা বা সৌন্দর্য সম্পাদন। এ হল মূলত লেখকের 'ভাষাশৈলী'র বিশ্লেষণ। এতে ভাষার উপাদানগুলির বিচারই মুখ্য।

ভাষার উপাদানগুলি ছাড়াও আছে কাব্যে গল্পে উপন্যাসে নাটকে আখ্যানের উপাদান, গ্রন্থনার উপাদান। সাহিত্যের সমস্ত শাখাই ভাষানির্মিত বটে, এবং ভাষাবিশ্লেষণ করলে অনেকগুলি শাখার প্রকাশকলার অনেকটা অংশই আমাদের কাছে আলোকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আখ্যাননির্ভর যেসব রচনা, সেগুলিতে আছে ভাষা ছাড়াও আর-একটি মাত্রা—আখ্যান। ভাষার ইউনিট বিষয়ে বিচার করার পাশাপাশি সেখানে বিচার করতে হবে আখ্যানের ইউনিটগুলিকে। একই সঙ্গে ভাষার ইউনিট ও আখ্যানের ইউনিটের জটিল সম্পর্ককেও অনুধাবন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাহিত্যকর্মে অর্থ বা আবেগ মূলত অ্যাবস্ট্র্যাকট বা অবস্তুক উপাদান। তা কোন্ রচনায় কতটা কোথায় আছে তা এক-একজনের কাছে এক-একরকম মনে হতে পারে, এ নিয়ে মতদ্বৈধ তৈরি হতে পারে। কিন্তু ভাষার বাক্য-বন্ধ শব্দ এবং ধ্বনি, আর অন্যদিকে আখ্যানের ওই নানা একক হল রচনার বস্তুগত বা কংক্রিট উপাদান। এগুলির গাণিতিক অস্তিত্ব বা বিস্তার সকলের কাছেই এক। আমাদের চলতি সমালোচনা বহুলাংশে রচনার ওই কংক্রিট উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করে, অর্থের প্রতিই তার মনোযোগ বড়ো বেশি। কিন্তু ওই

শারীরিক উপাদানগুলিকে যদি আমরা ভালোভাবে নজর করে দেখার সুযোগ পাই, তাহলে দেখব, রচনার অর্থেরও নানা উদ্ভাস বহন করে আনছে তার ভাষা বা গঠন সম্বন্ধে আমাদের সন্ধান।

আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান বা স্ট্যাটিস-টিক্স রচনার ওই কংক্রিট উপাদান-বিশ্লেষণের একটি বড়ো উপায়। স্ট্যাটিসটিক্সের ব্যাপ্তি এবং ঘনত্ব—দুইই রচনার চরিত্র বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। একজন লেখক যেসব বাক্য ব্যবহার করেছেন তার শব্দসংখ্যার হিসেব যতটা জরুরি, তেমনই তার চেয়ে বেশি জরুরি এক বিশেষ দৈর্ঘর বাক্য, যদি তিনি অন্য বাক্যের চেয়ে প্রচুর বেশিবার ব্যবহার করে থাকেন সেই হিসেবটা। আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানে স্ট্যাটিস-টিক্সের ব্যবহার ইদানীং একটু কমে এসেছে, কিন্তু মূলত শৈলীসংক্রান্ত গোয়েন্দাগিরির কাজে (যেমন নামহীন পাণ্ডুলিপি কোনো বিখ্যাত লেখকের কি না, তা নির্ধারণে) তার মূল্য এতটুকু কমে নি। কমপিউটারও এদিক থেকে শৈলীবিজ্ঞানকে সাহায্য করতে বেশ কিছু বৎসর হল নিযুক্ত হয়েছে। রচনার লেখককে নিরভুলভাবে নির্দেশ করতে পারে সংখ্যা-ভিত্তিক শৈলীবিজ্ঞান; তার অর্থই হল, এই শৈলী-বিজ্ঞান লেখকস্বভাবটিকে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে চায়।

ড. দেবনাথের গবেষণা "মেঘনাদবধ কাব্য"-এর আখ্যানের ইউনিটগুলিকে বিশ্লেষণ করে এই প্রয়াসেই লিপ্ত হয়েছে। কাব্যের যে এককগুলি তাঁর আলোচনার মূল ভিত্তি, সেগুলির নাম তিনি দিয়েছেন 'প্রসঙ্গ'। কাব্যের এক-একটি প্যারাগ্রাফ এক-একটি প্রসঙ্গের সূচক। প্রসঙ্গ ঠিক এপিসোড বা ঘটনাংশ নয়; প্রসঙ্গ হল আখ্যানরচনায় কবির অভিনিবেশ ধাপে-ধাপে এক-একটি সূত্রের উপর নিবদ্ধ হয়ে আস্তে-আস্তে একটি কবিতার প্রাসাদ নির্মাণ করেছে—সেই অনুচ্ছেদ-নিবদ্ধ সূত্রগুলি। তাতে ঘটনা আছে, নিছক বর্ণনা আছে, ঘটনা ও বর্ণনার মিশ্রণ আছে, উপমা ও অন্যান্য অলংকারপ্রয়োগ, সদৃশ্য-নির্দেশ, পৌরাণিক উল্লেখ ইত্যাদির সাহায্যে বর্ণনার foregrounding আছে। ড. দেবনাথ আমাদের প্রথমেই অবহিত করেছেন, "মেঘনাদবধ কাব্য"-এর ন-টি সর্গ এবং মোট ৬০৯২টি পঙ্‌ক্তির মধ্যে এ ধরনের প্রসঙ্গ মোট ২১৩টি।

প্রসঙ্গগুলি পঙ্‌ক্তিসংখ্যার হিসেবে নানা মাপের। সবচেয়ে ছোটো ৪ লাইনের প্রসঙ্গ আছে দুটি, পঞ্চম ও নবম সর্গে, আবার সবচেয়ে দীর্ঘ প্রসঙ্গটি হল অষ্টম সর্গে—মোট ২৪৮ পঙ্‌ক্তির। কত লাইনের কোন্ প্রসঙ্গ কাব্যে কতবার ব্যবহৃত হয়েছে তা ড. দেবনাথ লক্ষ করতে ভোলেন নি। ৩৬ পৃষ্ঠার লেখ ১-এর স্তম্ভচিত্রটিতে নজর করলেই দেখা যাবে যে ছোটো আকারের প্রসঙ্গ সবচেয়ে বেশি ষষ্ঠ সর্গে, আর বড়ো আকারের ও মাঝারি আকারের প্রসঙ্গ বেশি যথাক্রমে অষ্টম ও চতুর্থ সর্গে।

প্রসঙ্গগুলি থেকে কবির মনোধর্ম, কাব্যের মূল পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত লজিক এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি সর্গের চারিত্রধর্ম ইত্যাদি উদ্ধারের জন্য মোট আটটি সূত্র ব্যবহার করেছেন ড. দেবনাথ। সে সূত্রগুলি হল—প্রসঙ্গ-ক্রম (=যে ক্রমে বা order-এ প্রসঙ্গগুলি সাজানো), চরণ-ক্রম (=ক-টি লাইন, কীভাবে পরপর সাজানো সেই প্রসঙ্গে) প্রসঙ্গ-দৈর্ঘ্য (মোট ক-টি লাইন), প্রসঙ্গ-চিত্রের চলধর্ম, প্রসঙ্গ-স্বরূপ, প্রসঙ্গ-শক্তি, প্রসঙ্গ-পট, প্রসঙ্গের কথাবস্তু। 'চলৎ-ধর্ম' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন তাতে ঘটনাপর্যায়ের গতিবেগ কতটা অনুসৃত করা হয়েছে; সেই গতিকে তিনি 'সবল', 'চঞ্চল' এবং 'নিশ্চল' এই তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রসঙ্গ-স্বরূপ সূত্রটিতে আছে প্রসঙ্গের ঘটনা বা আবেগগত উপাদানের অনুপাত; সেই অনুসারে তিনি লক্ষ করেন কোনো প্রসঙ্গের স্বরূপ 'বেদনা', কোনোটির 'প্রেরণা', কোনোটির 'বর্ণনা', কোনোটির 'ঘটনা', কোনোটির বা বন্দনা। প্রসঙ্গ-শক্তি সূত্রটিতে ধরা

হয়েছে কাব্যের নাট্যিক দ্বন্দ্বের যে-দুটি পক্ষ—রাম ও রাবণ তাদের আপেক্ষিক প্রাধান্যের বিচারে; সে হিসেবে এই শক্তি তিনটি ভাগে বিন্যস্ত—'রাম', 'রাবণ' ও 'সম' অর্থাৎ যেখানে দুজনের প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য তুল্যমূল্য। প্রসঙ্গ-পট সূত্রটির তিনটি উপাদান—ব্যক্তি, স্থান ও কাল, এ তিনের উপস্থিতি অনুযায়ী। 'প্রসঙ্গের কথাবস্তু' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, নিছক আঙ্কিকের দিক থেকে আসছে প্রথম দুটি সূত্র, এবং শেষ চারটি সূত্র কাব্যের বস্তু বা কনটেন্টের সঙ্গে যুক্ত। তৃতীয় সূত্রটি—চলৎ-ধর্ম, মূলত ফর্ম থেকে কনটেন্টে উত্তরণ। মূল আলোচনায় প্রবেশ করে ড. দেবনাথ আর-একটি সূত্র এনেছেন, সেটি হল 'প্রসঙ্গ-বদলের গতিবেগ'। এই বদল-গতির চারটি চরিত্র—দ্রুত, স্বাভাবিক, মন্থর ও অতি-মন্থর। সর্গ অনুযায়ী আবার এর বৈচিত্র্যও লক্ষ করতে ভোলেন না ড. দেবনাথ। তিনি লক্ষ করেন নবম সর্গে আছে 'মন্থর আর দ্রুত-র মিশ্রণ'। পাঠককে এই 'সর্গ-বিশ্লেষণ' অংশটি (৭৮-৮৫) বিশেষভাবে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আছে 'প্রসঙ্গ-চিত্রের চলৎ-ধর্ম' নিয়ে আলোচনা। ড. দেবনাথ 'স্থির' 'চঞ্চল' এবং 'গতিময়' বা 'সচল'—এই তিন ধরনের চিত্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে মোট ২১৩টি প্রসঙ্গকে ওই তিনভাগে ন্যস্ত করেছেন, দেখিয়েছেন যে নিশ্চল প্রসঙ্গ আছে ৫৯টি, চঞ্চল ১০৯টি, সবল ৪৫টি। প্রসঙ্গ এবং চরণের শতকরা হিসেবও তিনি দিয়েছেন এই তিনটি ক্ষেত্রে—কিন্তু এই হিসেব খুব অর্থবহ হয়ে ওঠে না—যদি আখ্যানের ধারাবাহিকতার মধ্যে সর্গে-সর্গে তাদের অবস্থানটা আগে না নির্দেশিত হয়। তবু গোটা কাব্যের চরিত্র সম্বন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত এ থেকে পাওয়া অবশ্যই যায়। ওই কাজটা—অর্থাৎ আখ্যানের প্রবহমাণ বিস্তারে নিশ্চল চঞ্চল ও সচল প্রসঙ্গের হিসেব ড. দেবনাথ দেন ৯৩ পৃষ্ঠায়, এবং পরে চলতা-ধর্ম অনুযায়ী সর্গকেও চিহ্নিত করেন। উদাহরণ দিয়ে সব ক্ষেত্রেই বক্তব্যকে আরও সুনির্দিষ্ট করেন তিনি। 'সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যে চঞ্চল প্রসঙ্গচিত্রের প্রায় একাধিপত্য'—এ কথা জানিয়ে তিনি এ কাব্যেরই বিশেষ চরিত্রকে তুলে ধরেন। যেন একটি গতিশীল চিত্রনাট্যের মতো নিশ্চলতা থেকে সচলতা, তারপর অন্তিম নিশ্চলতায় এ কাব্যের পরিবৃত্তটি গড়ে উঠেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'প্রসঙ্গ-স্বরূপ', পঞ্চমে 'প্রসঙ্গ-শক্তি', ষষ্ঠে 'প্রসঙ্গ-পট' ইত্যাদির আলোচনাও একই রকম সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও বিচারাগ্রহের পরিচয় বহন করছে। আমাদের আলোচনা অতি বিস্তারিত করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এর মধ্যেই নিশ্চয়ই পাঠকের মনে এই কাজটির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হয়েছে। 'উপসংহার' অংশে যখন গ্রন্থকার প্রথম 'ছটি অধ্যায় থেকে কাব্যগত সাধারণ সিদ্ধান্তগুলো সূত্রবদ্ধ' করেন, তখন আমরা বুঝতে পারি তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তের নিচেই তিনি তৈরি করে রেখেছেন গাণিতিক পর্যবেক্ষণের শক্ত জমি। ২২৮-২৯ পৃষ্ঠায় চলৎকার ছটি ছকে মধুসূদনের Organic Planning-চেহারাটিকে তিনি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। এই অংশের অন্যান্য ছকও সমান আকর্ষক। এ কাজে তিনি রাশিতত্ত্বের একাধিক লেখ-প্রণালী (বার ডায়াগ্রাম, পয়েন্ট প্লটিং মালটিপ্‌ল বার ডায়াগ্রাম, স্পেশিয়াল সিরিজ বার ডায়াগ্রাম প্যারাবোলা, ত্রিভুজ ইত্যাদি) ব্যবহার করেছেন। সেগুলি যে-পাঠক অনুধাবন করতে পারবেন তিনি পুরস্কৃত হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু যিনি পারবেন না তিনি আলোচনাতেই সমস্ত জরুরি সংবাদ পেয়ে যাবেন।

যে-কোনো গবেষণায় একটি দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতা এই দাঁড়িয়ে যায় যে, গবেষণার বিষয় লেখক বা গ্রন্থ যাই হোক না কেন, তিনি বা তা যে আর সকলের চেয়ে কত ভালো, তাদের মধ্যে যে কোনো খুঁতই নেই—এই রকম একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করতে সকলেই প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ড. দেবনাথের ভাষায় সামান্য

একটু উচ্ছ্বাস আছে, একটু অলংকরণের প্রবণতা আছে কোথাও-কোথাও। যেমন 'গতিশীল দ্রষ্টার সঙ্গে আত্মলীন পাঠক তার স্নায়ুতে চলিষ্ণু চেতনার মৃদু স্পর্শ অনুভব করছেন'। মাঝে-মাঝে তাঁর সিদ্ধান্তে 'অনিবার্য ছিলো', 'বিকল্পহীন কৌশল', 'নিঃসন্দেহে সংগত এবং সমীচীন', 'নিঃসন্দেহে অনুমোদন-যোগ্য' 'অপরিহার্য হয়ে উঠেছে' ইত্যাদি প্রয়োগ একটু বেশি দাবি করে, এমন মনে হতেও পারে, যদিও তাঁর সমস্ত দাবিই গাণিতিক তথ্যের দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু ড. দেবনাথের বিচক্ষণতা তাঁকে চেনা গবেষকের অন্ধ স্তাবকতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। ফলে ২৪০ পৃষ্ঠায় আখ্যানের একটি-দুটি মৌলিক দুর্বলতার কথা জানিয়ে চমৎকার মন্তব্য করেন তিনি—"দুর্ভাগ্যত, মহাকাব্যের অন্তরঙ্গ রূপের দাবি মেটাতে গিয়ে কবি ব্যর্থ হলেন বহিরঙ্গ রূপকর্মে।" আমাদের মতে নরকবর্ণনা ইত্যাদি মহাকাব্যের বহিরঙ্গের অন্তর্গত। অন্তরঙ্গ নয়। জানি না, এ মন্তব্যে 'অন্তরঙ্গ' আর 'বহিরঙ্গ' কথাদুটির স্থান-বিনিময়ই তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল কি না। যদি তা নাও থাকে, তবু গবেষক হিসেবে তাঁর সততা ও বিচার-বোধের বিষয়টি এখানে আমাদের অগোচর থাকে না।

পরিশিষ্ট ক-টিও মূল্যবান। এতে মূল গ্রন্থে আলোচিত স্থানের ভূগোল ও কালের সূক্ষ্ম হিসেবকে আরও বিস্তার দিয়েছেন ড. দেবনাথ, প্রসঙ্গগুলিকে আরও নানা মাত্রা থেকে দেখা হয়েছে। পত্রাবলিতে 'মেঘনাদবধ' প্রসঙ্গ, সারণীর ব্যাখ্যা, রাশিতত্ত্বের পরিভাষা—সবই পাঠককে প্রচুর সাহায্য করবে।

পরিশেষে একটি কথা। ফর্মাল চলিত বাঙলায় 'শুলো' 'পরে' এবং অতীত-ভবিষ্যতের ক্রিয়ারূপে প্রথম ও উত্তম পুরুষের বিভক্তিতে ও-কার ব্যবহারের দরকার নেই বলেই মনে হয়।

প্রসঙ্গ : নজরুল

সুজিৎ ঘোষ

লেখকের "এবং নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" গ্রন্থ নজরুলের বিভিন্ন দিক নিয়ে কুড়িটি প্রবন্ধের সংকলন। এপার বাঙলার চেয়ে ওপার বাঙলায় নজরুলের ওপর বেশি আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। তিতাশ চৌধুরীর প্রবন্ধসংকলনটি আরও একটি সংযোজন। সংকলনের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ কৌতূহল জাগায়—কিন্তু সামগ্রিক পরিকল্পনার অভাবে আস্তর সংহতি আসে নি পুরো বইটিতে। গ্রন্থে "নজরুল ইসলামের বাল্যরচনা" প্রবন্ধটি ভালো লাগবে। উৎসর্গপত্রের নজরুল-এ বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। দৈর্ঘ্য অতি কম হলেও, "অসাম্প্রদায়িক নজরুল : এক, দুই" প্রবন্ধ দুটির আলোচনায় এক ভিন্ন মাত্রা সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু লেখকের বক্তব্য, 'পরিশেষে স্বীকার করতেই হয়, অসাম্প্রদায়িক কবি হিসেবে নজরুল শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।' রবীন্দ্রনাথের নাম স্মরণে না এনেও মনে হয়, এ উক্তি কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি। প্রসঙ্গত 'ভূমিকা'য় আবু রুশ্‌দ্ "শনিবারের চিঠি"তে নজরুলের প্রতি মোহিতলাল ও সজনীকান্তর মনোভাবকে 'ঘোরতরভাবে সাম্প্রদায়িক মনের বিষোদগার' বলেছেন। কিন্তু তিতাশ চৌধুরী এ গ্রন্থের অন্তর্গত "শনিবারের চিঠি ও কাজী নজরুল ইসলাম" প্রবন্ধেও মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের বিরোধ এক দুঃখজনক ভুলবোঝাবুঝির ফলে ঘটেছিল, তা অস্বীকার করেন নি। বরং এই প্রবন্ধেই নজরুলের ওপর মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার প্রায় তাণ্ডবের তথ্য শ্রী চৌধুরীই হাজির করেছেন। এবং "শনিবারের চিঠি" যাঁরা

এবং নিষিদ্ধ নজরুল এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ : তিতাশ চৌধুরী, ১৯৯০, ভিনাস প্রকাশনী, ঢাকা। মূল্য ১৫০ টাকা।

ঘেঁটেছেন, তাঁরাই জানেন যে সজনী দাসের 'অনুদার' 'রুচিহীনতার পরিচয়' একেবারেই অসাম্প্রদায়িক—ধর্মীয় অর্থে। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও "কল্লোলে"র আধুনিক সাহিত্যিকমাত্রেই সজনী দাসের রুচিহীন ব্যঙ্গবিদ্রূপের শিকার হয়েছেন। "শনিবারের চিঠির" "সাম্প্রদায়িকতা" আবিষ্কার করতে গেলে, বরং বলা উচিত যে তারা দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, একটি "শনিবারের চিঠি" সম্প্রদায়, অন্য সম্প্রদায়টি যারা "শনিবারের চিঠি"র দলভুক্ত নয়।

মধুসূদন ও জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে নজরুলের তুলনা একটু দুরাগত এবং মনে হয় অপ্রয়োজনীয়—এভাবে সাদৃশ্য আলোচনায় হোমার বা মিলটনের সঙ্গেও তুলনা চলতে পারে—একটি সামান্যীকৃত ভিত্তিভূমি—দুটি ব্যক্তিত্বই কবি, এই সাদৃশ্যবশত দুজনের আলোচনা, সমালোচনামূলক আলোচনাকে অনাবশ্যক কল্পনাশ্রয়ী করে তোলে। বরং ১৮৯৯ সালে নজরুল ও জীবনানন্দ—উভয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কবিত্বের বিকাশ ও পরিণতিতে যে ভিন্নতা—সে বিষয়ে আলোচনার একটি ক্ষেত্র অপূর্ণ রয়ে গেছে।

ভালো লাগবে "কাজী নজরুল ইসলাম : রবীন্দ্রনাথের চোখে" নিবন্ধটি। "বিদ্রোহী কবির বিজ্ঞান চর্চা" প্রবন্ধটি বহুবারম্ভে লঘুক্রিয়া এবং বাজারি বইগুলিতে ছাড়া "হস্তরেখা বিজ্ঞান" বলে কোনও 'বিজ্ঞান' আছে বলে শুনি নি। 'দৌলতপুরে নজরুল' প্রবন্ধে নজরুলকে অল্প জানা যায়, দৌলতপুর-বাসীদের এ প্রবন্ধটি বেশি করে ভালো লাগবে। 'এবং নিষিদ্ধ নজরুল' প্রবন্ধের নামানুসারে এই গ্রন্থের নামকরণ। প্রকৃতপক্ষে এপার-বাঙলায় শিশির করের 'নিষিদ্ধ নজরুল' (১৯৮৩) বহু আগেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য, তিতাশ চৌধুরী তাঁর গ্রন্থপঞ্জীতে শিশিরবাবুর গ্রন্থটি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। চব্বিশ পৃষ্ঠার তিতাশ চৌধুরীর প্রবন্ধটি স্বভাবতই শিশির করের একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের মতো বিশদ তথ্যসমন্বিত নয়।

'নিষিদ্ধ' চিহ্নিত থাকলেই মানুষের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। কিন্তু, যেহেতু এপারে উক্ত নামে একটি গ্রন্থ আগেই প্রকাশিত হয়েছে এবং তিতাশ চৌধুরীর তা জানা ছিল, সেকারণে গ্রন্থের নামকরণ নীতি-গত কারণে ভিন্ন হতে পারত।

তিতাশ চৌধুরীর ভাষা সহজ-সরল, কোথাও-কোথাও কিছু পরিমাণে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করা যেত। গ্রন্থপঞ্জী পরবর্তী নজরুল-চর্চায় সহায়ক হবে। ছাপা-বাঁধাই কাগজ খুব ভালো। ২৩০ পৃষ্ঠায় ১৫০ টাকা দামটা কিছু বেশি।

বাঙলায় গাছের বই

সুনীলকান্তি ধর

ইংরেজিতে এ. পি. বেনথালের ২৭৬টি গাছের বর্ণনা-সংবলিত *The Trees of Calcutta and its Neighbourhood* নামের অমূল্য বইটি ১৯৪৩ সালে থ্যাকার স্পিঙ্ক কো প্রকাশ করে। তারপর দীর্ঘ ৪৫ বছরে কলকাতার তথা বাঙলার গাছের বিষয়ে তেমন তথ্যবহুল, বৈচিত্র্যময় কোনো বই পাওয়া যায় নি। কিন্তু বাঙলাভাষী বৃক্ষপ্রেমিক ইংরেজি জানলেও বেনথালের বইটি বহুদিন হল দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে পথে পার্কে চোখে-পড়া গাছ সম্পর্কে তাঁর জানবার ইচ্ছে পূর্ণ হয় নি। তা ছাড়া, গত ৪৫ বছরে কলকাতার গাছের অবস্থানচিত্রও বদলে গেছে। নানা কারণে সেদিনের অনেক সুন্দর পথতরুর আজ অস্তিত্ব নেই।

১৯৬২ সালে ড. তারকমোহন দাস "আমার ঘরের আশেপাশে" বইটি লিখে বাঙালি পাঠককে

কলকাতার গাছ—রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী। জেনারেল প্রিনটার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা। পঁচিশ টাকা।

তৃষ্ণার জল দিলেন। তবু তা হয়ে রইল অতি সামান্য। বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগে ড. দাস একটি সুন্দর রচনা সৃষ্টি করলেও বইটির স্বল্পায়তনের জন্য অনেক সাধারণ পথিপার্শ্ব বৃক্ষ উপেক্ষিত হয়ে রইল। ১৯৬৮ সালে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ড. সান্তাপাউর ৩৬টি ভারতীয় গাছের বর্ণনা সংবলিত *Common Trees*-এর বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করে। ট্রাস্ট ড. রানধাওয়ার *Flowering Trees*-এর বাঙলা অনুবাদ "পুষ্পবৃক্ষ" বইটিও প্রকাশ করে। কিন্তু এই বই দুটিরও সীমিতসংখ্যক গাছের বর্ণনা বেনথালের অভাব মেটাতে পারে নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরো ২২ বছর প্রতীক্ষার পর রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর "কলকাতার গাছ" বইটি পেয়ে বৃক্ষরসিক বাঙালি খুশি হবেন। এই আনন্দের কারণ একাধিক। বইটিতে কলকাতার পথে উদ্যানে চোখে পড়ে—এমন একশটি গাছের বর্ণনা আছে। প্রতিটি গাছের (বা অংশের) ফুলের এবং ফলের ছবি থাকাতে শনাক্তকরণ সহজ হয়েছে। তা ছাড়া, কলকাতার কোন্ রাস্তায় বা পার্কে গাছটি আছে, তার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। প্রতিটি গাছের আকৃতি, সৌন্দর্য, উপযোগিতা, ভেষজগুণ এবং বৈজ্ঞানিক নাম লেখক স্বল্প কথায় প্রাঞ্জলভাবে লিখেছেন। বইটির একটি বড়ো গুণ এর সুলভতা। প্রচ্ছদপট সুন্দর এবং মুদ্রণ ত্রুটিহীন। বইটি পরিবেশ-সচেতনতার যুগে নিত্যসঙ্গী গাছের কথা জানতে কৌতূহলী জাত বৃক্ষপ্রেমী ছাড়াও স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছে আদরণীয় হবে।

বইটির কিছু ত্রুটি আছে—আশা করি পরবর্তী সংস্করণে তা শোধরানো হবে। কিছু গাছের অস্তিত্বের কথা জানাতে লেখক পুরো রাস্তার নাম দিয়েছেন—সঠিক লোকেশন নেই। কিছু বর্ণনায় ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। *Ailonthus Excelsa* গাছটির প্রচলিত বাঙলা নাম স্বর্গবৃক্ষ। ইংরেজিতে একে *Tree of Heaven* বলা হয়। ড. সান্তাপাউর বইটির বাঙলা অনুবাদেও একে স্বর্গবৃক্ষ বলা হয়েছে। এই গাছটিকে "স্বর্গবৃক্ষ" বলে অভিহিত করে লেখক ভুল করেছেন। এটা অবশ্য মানতে হবে যে, অনেক গাছেরই সর্বগ্রাহ্য বাঙলা নামকরণ শক্ত। অনেক ক্ষেত্রে একই গাছকে নানা নামে বা বিভিন্ন গাছকে একই নামে অভিহিত করা হয়। যেমন, "মহানিম"। অনেক গাছ বহু বছর আগে বিদেশ থেকে এসে এদেশে এখন সাধারণ গাছের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু এদের সঠিক বাঙলা নামকরণ হয় নি। মনে হয়, লেখকও এই বিষয়ে সচেতন এবং বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য কিছু গাছের বেলায় শুধু বৈজ্ঞানিক নামটি ব্যবহার করেছেন।

চারটি বাঙলা নাম লেখক রবীন্দ্রনাথের দেওয়া বলে জানিয়েছেন। যেমন, সোনাঝুরি (*acacia moniliformis*), রক্তঠাট (*kigelia pinnata*), ঘণ্টাকর্ণ (*Spathodea Campanulata*) এবং হিমঝুরি (*Millingtonia horteusis*)। কিন্তু একটি নাম ছাড়া এই নামগুলির উৎস সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। *Spathodea Campasulate* যাকে ইংরেজিতে Scarlet bell বা tulip tree বলা হয়, তাকে রবীন্দ্রনাথ "ঘণ্টাকর্ণ" নাম দিয়েছিলেন বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। আবার এই একই গাছকে রবীন্দ্রনাথ "অগ্নিশিখা" নাম দিয়েছেন বলে বুদ্ধদেব গুহ লিখেছেন ("পুজোর সময়", আনন্দ পাবলিশার্স, ৬৭ পৃষ্ঠা)। নামকরণে গুরুদেব অকৃপণ ছিলেন—গাছের বেলাতেও হয়তো এটা প্রযোজ্য। তবে "অগ্নিশিখা" নামটি কিন্তু বেশি রবীন্দ্রনাথসুলভ আর শ্রুতিসুখকর। পুষ্পিত গাছটির রূপের সঙ্গে নামটি মেলেও ভালো।

অনেক সাধারণ গাছের সঠিক বাঙলা নামের খোঁজে বৃক্ষপ্রেমী আজ কিছুটা বিভ্রান্ত। বৃক্ষ-সচেতনতা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে যদি কোনো সংস্থা গাছের স্থানীয় (লিঙ্গুয়িসটিক) নামের ক্যাটালগ বিষয়ে অগ্রসর হন, তা হলে এই বিভ্রম যাবে।

উপসংহারে, বোটানিকাল নামকরণের একটি কৌতুককাহিনী সম্বন্ধে লিখছি। প্রয়াত বীরেন্দ্রকুমার বসু (আই. সি. এস.) বৃক্ষপ্রেমী ছিলেন। তিনি একটি ধূলিধূসর পথিপার্শ্ব বৃক্ষ দেখিয়ে আইনজীবী প্রয়াত নরেন্দ্রকুমার বসুকে গাছটির নাম বলতে চ্যালেনজ করেন। উকিল মশায় চট করে জবাব দেন—Roadside Dustifolia।

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ভ ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তিনাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

মতামত

১

মানবমনে হিংসা প্রশমনে বিজ্ঞান ও সমাজ

মানবমনে হিংসাভাব প্রশমনে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব সংবলিত মাননীয় মহম্মদ ফজলে কাদের মহাশয়ের রচনাটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি রচনা ও মতামতের (শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, মার্চ ৯১; শ্রীমতী বৈশালী সিন্‌হা, মে ৯১; এবং শ্রীস্মরজিৎ দাস, অগস্ট ৯১) ধারাবাহিকতায় প্রাসঙ্গিক রচনাটি পড়ে মনে হল—হিংসাভাব প্রশমনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার তখনই সম্ভব, যখন এই বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হবে যে হিংসাভাব প্রকৃত পক্ষে অপরাধ নয়—অসুস্থতা। সেক্ষেত্রে প্রথম বাধা হবে দীর্ঘ প্রচলিত ব্যক্তিমালিকানার কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা। কেননা, এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শর্তই মানবমনের হিংসাভাবকে প্রকট করে তুলে মানুষকে হিংস্র অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। আবার এই ব্যবস্থাই অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে ব্যবস্থাগত ত্রুটির দায় অস্বীকার করতে চায়। তাই কয়েক হাজার বছর যাবৎ সমস্ত পৃথিবীতেই অপরাধের জন্য অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার নীতি প্রচলিত রয়েছে। কায়েমি স্বার্থরক্ষাকারী দীর্ঘপ্রচলিত এই অবৈজ্ঞানিক ধারণা এবং ব্যবস্থাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশ তথা প্রয়োগের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

মাননীয় মহম্মদ ফজলে কাদেরের প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কয়েকটি দিক উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি।

চুলের রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করে শিকাগোর আরগোন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির জীব-বিজ্ঞানীরা যেমন প্রমাণ করেছেন যে অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের চুলে দস্তা, তামা, কোবাল্ট ইত্যাদি ধাতব উপাদান অধিক মাত্রায় থাকে, তেমনি সোভিয়েত রিসার্চ সেনটারের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে কপার, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন ইত্যাদি উপাদানের তারতম্যর কারণে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা দেখা দেয় (সূত্র: "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান", জুলাই, '৯১, ওভারল্যানড ১০. ৫. ৯১)। তাহলে কি চুলের রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণগত তারতম্যকে অসুস্থতা বলে চিহ্নিত করা হবে না?

জর্জিয়া স্টেট ইউনিভারসিটির এক গবেষক প্রমাণ করেছেন যে, টেস্টোস্টেরন হর্মোনের প্রভাবে মানুষ হিংস্র আচরণ করে (সূত্র: "দেশ", ১৯. ৫. ৯০) তবে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে পারি-পার্শ্বিক কারণ মানুষের হিংসাভাবকে উদ্দীপিত করে। অর্থাৎ, হিংসাভাবের পিছনে কাদের-উল্লিখিত আভ্যন্তরীণ কারণই একমাত্র বিবেচ্য নয়, পরিবেশ-গত কারণকেও আবশ্যিকভাবে বিবেচনা করা দরকার।

লক্ষণীয় হল, কর্তৃত্ববাদী দর্শনের প্রভাবে সম্পৃক্ত ধর্মীয় অনুশাসন এবং নৈতিক মূল্যবোধগুলো মানুষের মন থেকে হিংসাভাব বা অপরাধপ্রবণতা দূর করার জন্য পরিবেশগত কারণকে গুরুত্ব না দিয়ে ব্যক্তির পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ব্যক্তি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্কের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অস্বীকার করে, ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ব্যক্তির আচরণের বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক একটা পদ্ধতি। তাই পরিণতিতে শ্রীকাদেরকে পরিতাপের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়েছে,

'ধর্ম তার কাজ করেছে। যাঁরা কেবলমাত্র নীতি এবং মূল্যবোধ শিক্ষার গুরু, তাঁরাও তাঁদের কাজ করেছেন, কিন্তু মানুষের মন থেকে হিংসাভাব কমে নি।' কাদেরও কর্তৃত্ববাদী দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। ফলে হিংসাভাব দমনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রস্তাবটি আপাতদৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসমৃদ্ধ মনে হলেও যেহেতু তিনি মানবমন ও আচরণকে সমাজনিরপেক্ষভাবে বিচার করে, সমাজ থেকে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে, ব্যক্তির মন থেকে হিংসাভাব প্রশমনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই চূড়ান্ত বিচারে তাঁর প্রস্তাবটি অবৈজ্ঞানিক প্রতিপন্ন হতে বাধ্য।

জীববিজ্ঞান, মনঃশরীরবিজ্ঞান, জীবরসায়ন-বিজ্ঞান, এবংসমাজমনোবিজ্ঞানের বক্তব্যর ভিত্তিতে বলা যায় জীবের যাবতীয় আচরণের পিছনে থাকে অস্তিত্বরক্ষা ও বংশবিস্তারের জৈব ধর্ম পালনের প্রয়াস। সে ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করলে তখন জীবের দেহ ও মনের জৈব-রাসায়নিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। পরিণতিতে জীব কখনও হিংস্র অপরাধমূলক আচরণের মাধ্যমে পরিবেশগত বাধা ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়। আবার কখনও বাধার কাছে আত্মসমর্পণ করে অসুস্থতার মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংস করে। জগতের বহু বিষয় পরিবর্তনযোগ্য হলেও জীবের জৈব ধর্ম পালনের তাগিদ এবং পারিপার্শ্বিকতাসাপেক্ষ এই প্রতিক্রিয়া অপরিবর্তনযোগ্য একটা বিষয়, যা অস্বীকার করে কোনও প্রস্তাব ও প্রয়োগ সফল হতে পারে না।

সিবাস্টিয়ান রোজারিও
ইন্দাস, বাঁকুড়া

২

"শরৎ-শিরাজী-সত্যেন্দ্রনাথ"

"চতুরঙ্গ" জুলাই ১৯৯১ সংখ্যা পড়লাম। ভালো লাগল নীহাররঞ্জন রায় ও 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব প্রসঙ্গে তথ্যঋদ্ধ আলোচনা দুটি। অন্যান্য রচনাগুলিও ভাবনার খোরাক যোগায়।

আমার এ চিঠি লেখার মূল উদ্দেশ্য গ্রন্থসমালোচনা প্রসঙ্গে দু চার কথা বলা। শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় "শরৎ-শিরাজী-সত্যেন্দ্রনাথ" শিরোনামে তিনটি গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রসঙ্গে গ্রন্থটিতে আমার একটি প্রবন্ধ আর তার আলোচনা থাকায় সংগত কারণে কিছু বলার দাবি থাকে।

আমার প্রবন্ধটির নাম "পুরাণপ্রতিমার রূপকার কবি সত্যেন্দ্রনাথ"। মিথ বা পুরাণ কী বোঝাতে গিয়ে আমি কেন সুনীতিকুমার বা আর. সি. হাজরার কথা বলি নি—এ নিয়ে শক্তিবাবুর ক্ষোভ জেগেছে। কিন্তু আমি তো শুধু একজনকেই উল্লেখ করি নি, বলেছি নীহাররঞ্জন রায়, হেনরী ফ্রাঙ্ককোর্ট প্রমুখের কথাও। আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু মৌলসূত্র ধরিয়ে দেওয়া, আলোচনাকে প্রাঞ্জল করা। সে কাজে সমর্থ হয়েছি কিনা সমালোচক তা বললেন না।

আরেকটি কথা। "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"-কে আমি পুরাণ বলি নি। বস্তুবাদী দৃষ্টিতে উপাসক-দের বিচার করেছিলেন অক্ষয়কুমার। সেই চেতনা-ই সত্যেন্দ্রনাথে সঞ্চারিত—এই রকমই বলার উদ্দেশ্য ছিল। প্রসঙ্গত শক্তিবাবু মন্দাক্রান্তার ঠাট বলেছেন ৮+৭+৭+৫=২৭ মাত্রার। মন্দাক্রান্তা সতেরো অক্ষরের ছন্দ। কিন্তু তিনি যে ভাগ করেছেন তা মন্দাক্রান্তা নয়, এটুকুই বলা যায়। 'সিংহল' কবিতাটি স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত—দুই রীতিতেই পাঠ করা যায়।

তরুণ মুখোপাধ্যায়
বাংলা বিভাগ, চন্দননগর
কলেজ, হুগলী

"দীর্ঘমেয়াদি অর্থনীতি : অসার তত্ত্ব"

অকটোবর ১৯৯১ সংখ্যায় মাননীয় সন্তোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের "বামফ্রন্ট সরকারের 'দীর্ঘমেয়াদি অর্থনীতি: অসার তত্ত্ব—" শীর্ষক বিতর্কমূলক আলোচনাটি পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। লেখাটিতে দেশ, জনগণ এবং অর্থনীতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ আলোচনা, সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা আদৌ গুরুত্ব পায় নি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায়, কোনো দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি বলতে বোঝায় উৎপাদনবৃদ্ধি। উৎপাদনবৃদ্ধি তখনই সম্ভব, যখন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদের চূড়ান্ত ব্যবহারের সুযোগ থাকে, । সেক্ষেত্রে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি বলতে বোঝায় সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র দেশবাসীর আর্থিক সমৃদ্ধি। এর জন্য দরকার প্রয়োজনভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থা, যা একমাত্র সমষ্টিগত সম্পদ-মালিকানা-ব্যবস্থাতেই সম্ভব।

বাস্তবে যখন কোনো দেশের অর্থনীতির নীতিগত ভিত্তি হয় ব্যক্তিগত সম্পদ-মালিকানা, তখন অর্থ-নীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া আর নিরপেক্ষ থাকে না। কারণ তখন সমগ্র উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় মুনাফার স্বার্থে। সমগ্র প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক সম্পদ চূড়ান্তভাবে ব্যবহার করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বাজারে পণ্যের চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য বিধান হবে। সেক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনের সুযোগ হ্রাস পাবে এবং ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্যোগ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ হারাবে। তাই ব্যক্তিগত মালিকানার মুনাফাসাপেক্ষ আর্থ-রাজনৈতিক প্রক্রিয়া মুনাফার স্বার্থে একাধিক কৌশল অবলম্বন করে—(১) প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদের অন্তর্নিহিত সম্পদসম্ভাবনা যথার্থভাবে কাজে না লাগিয়ে উৎপাদন কম রাখার চেষ্টা করে। (২) সুপরিকল্পিতভাবে আন্দোলন সংগঠিত করে উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে অতি-উৎপাদনজনিত সংকট থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। (৩) প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে ঘাটতি রেখে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। (৪) প্রয়োজনীয়-দ্রব্য উৎপাদনে বিরত থেকে সমরাস্ত্র উৎপাদনে সচেষ্ট হয়। (৫) উৎপাদিত দ্রব্য নষ্ট করে ফেলে। (৬) হিংসাশ্রয়ী ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলন সংগঠিত করে বাজার তৈরির ব্যবস্থা করে কিন্তু কখনও সমষ্টির প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধিকে প্রাধান্য দেয় না। দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার-ভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থার এই ছবি থেকে বোঝা যায় যে প্রযুক্তি, মূলধন, কাঁচামাল, উৎপাদন যে ধরনের হোক না কেন, তাতে দেশ ও দেশবাসীর কিছুই এসে যায় না। কারণ ব্যক্তিমালিকানার মুনাফাসাপেক্ষ অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শর্ত অনুসারে সমগ্র অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, যাতে অধিকাংশ মানুষের বঞ্চনার বিনিময়ে মুষ্টিমেয় মানুষের সমৃদ্ধি ঘটে। মুষ্টিমেয় মানুষের সমৃদ্ধিকেই প্রচার করা হয় দেশের সমৃদ্ধি বলে।

এবার আসা যাক আন্তর্জাতিক বাজারের আঙিনায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াই ব্যক্তিমালিকানার মুনাফাসাপেক্ষ অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মুনাফার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় হল কাঁচামাল ও মানবসম্পদ কম দামে সংগ্রহের সুযোগ এবং উৎপাদিত পণ্য বেশি দামে বিক্রয়ের বাজার।

তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রই সচেষ্ট থাকে মুনাফার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অধিকার করার জন্য। যে-সমস্ত কৌশলে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়ে তার কাঁচামাল, মানবসম্পদ ও বাজার দখলের চেষ্টা করে তার মধ্যে অন্যতম হল (১) উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনায় ঋণদান। (২) সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের প্ররোচনা। (৩) গৃহযুদ্ধ বা অন্তর্ঘাতমূলক কার্যে প্ররোচনা। (৪) চিকিৎসা খাতে ব্যয়বৃদ্ধির প্ররোচনা। (৫) মাদকদ্রব্যর প্রসার। (৬) আমদানি

রফতানি চুক্তির কুটকৌশল। (৭) শাসকদলকে প্রভাবিত করে স্বার্থসিদ্ধি করে নেওয়া। (৮) এক এলাকার প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদে উৎপাদিত পণ্য অন্য এলাকায় বিক্রয় করা, এবং (৮) যুদ্ধ।

ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থনীতিতে দেশের অভ্যন্তরে যেমন মুষ্টিমেয় মানুষের সমৃদ্ধির বিপরীতে থাকে অধিকাংশ মানুষের বঞ্চনা, একইভাবে আন্ত-র্জাতিক স্তরে মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির জন্য অধিকাংশ রাষ্ট্রের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে যায়। এর সাথে শিল্প, কৃষি, প্রযুক্তি উৎপাদনের পরিমাণ বা শাসক রাজ-নৈতিক দল পরিবর্তনের কোনো সম্পর্ক নেই। যে দলই শাসনে থাকুক এবং যেভাবেই উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হোক না কেন, ব্যক্তিমালিকানার আর্থ-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ঢেঁকিকলের মতো এক পক্ষের অর্থনৈতিক সংকটই অন্য পক্ষের আর্থনীতিক সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে।

তবু যেহেতু ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে জনগণের ভোট ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা বা ক্ষমতায় আসীন থাকা সম্ভব হয় না, তাই জনগণ যাতে আর্থ-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রকৃত ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হতে না পারে, তার জন্য নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি, —বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অভিযোগ, পালটা অভিযোগ এবং তাত্ত্বিক তর্কবিতর্কের ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে বাজারভিত্তিক ব্যক্তি-মালিকানার মুনাফাসাপেক্ষ অর্থনীতি আজ এমন স্তরে পৌঁছিয়েছে, যেখানে অধিকাংশ মানুষের বঞ্চনা ছাড়া মুষ্টিমেয় মানুষের সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। একইভাবে অধিকাংশ রাষ্ট্রের পশ্চাদ্‌গতি ছাড়া মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রের অগ্রগতি অসম্ভব।

তাই আজ এক নয়া বিশ্ব আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। এই ব্যবস্থায় বিশ্বের সমগ্র সম্পদ ব্যক্তিগত ও প্রচলিত রাষ্ট্রগত মালিকানা থেকে মুক্ত করে এক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। মুনাফাসাপেক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করতে হবে প্রয়োজনসাপেক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থায়, বাজার ভিত্তিক প্রতিযোগিতা-নির্ভর অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করতে হবে চাহিদা-ভিত্তিক সহযোগিতা-নির্ভর অর্থনীতিতে। বিশ্বের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষ ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধিতে ব্যবহার না করে ব্যবহার করতে হবে সমগ্র মানবসমাজের স্বার্থে।

অয়ন মুখার্জী
গুসকরা, বর্ধমান

ভোগ ও ত্যাগের দর্শন

বামফ্রন্ট সরকারের প্রস্তাবিত দীর্ঘমেয়াদি অর্থনীতির তত্ত্ববিশ্লেষণী নিবন্ধটি (সন্তোষ ভট্টাচার্য, অকটোবর ১৯৯১), অত্যন্ত সময়োচিত বলে মনে হয়েছে।

দেশের মুমূর্ষু অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে পরিবর্তিত করার মানসে সমালোচক এবং সমালোচিত উভয়েই একমত যে উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়া তা সম্ভব নয়। উৎপাদনবৃদ্ধির পূর্বশর্ত হিসাবে মূলধনের পরিমাণবৃদ্ধির প্রশ্নেও উভয়পক্ষ একমত। দ্বিমতের প্রশ্ন কেবল একটি প্রসঙ্গে—তা হল মূলধন-বৃদ্ধির উপায় বা পথ কী হওয়া উচিত।

আমরা যে সমাজে বড়ো হই—আমাদের অজ্ঞাতসারে অথবা জ্ঞাতসারে সেই সমাজে প্রচলিত কোনো না কোনো দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করে। আমাদের চিন্তা, আচার, আচরণ, প্রস্তাব, সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই সমৃদ্ধ চেতনার একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। অর্থনীতি প্রসঙ্গে সমালোচক এবং সমালোচিত উভয়ের দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিগত দ্বন্দ্ব বা বিরোধ। সমালোচিত বামফ্রন্ট সরকারের প্রস্তাবিত অর্থনীতির মূলে সক্রিয় রয়েছে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শনের

প্রভাব। অন্যদিকে সমালোচক সন্তোষ ভট্টাচার্যর সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিকল্প প্রস্তাব প্রাচ্যের ত্যাগবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। ভোগ ও ত্যাগের প্রশ্নে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গির বিভেদ সমকালীন নয়, বরং বলা চলে সুপ্রাচীন। দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়ে আজও চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয় নি, যথার্থ অর্থে মানবকল্যাণে কোন্ দর্শন সঠিক হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। কেন না, বাস্তব প্রয়োগে কোনো দর্শনই 'সর্বজনহিতায়' হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সে কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। তাই উভয় পক্ষের অর্থনৈতিক প্রস্তাবের যথার্থতা বিচারের স্বার্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ত্যাগ ও ভোগের দর্শনের ব্যর্থতার কার্যকারণসম্পর্ক উদ্ধার ও উপলব্ধি অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয়।

জৈব বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় অভিযোজন ও ক্রমবিকাশের পথে জীবের দেহ ও মস্তিষ্কের গঠন-পদ্ধতি ও কার্যকারিতা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। জৈব বিবর্তনের এই নিয়ম অনুসারে মানুষ এক জটিল গঠনের মস্তিষ্কের অধিকারী। মানব-মস্তিষ্কের এই গঠনগত বিশেষত্বই মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে সাহায্য করেছে।

উপনিষদের বর্ণনা অনুসারে, জগৎ ও জীবনের উদ্ভবের মূলে ছিল হিরণ্যগর্ভর এক হতে বহু হওয়ার আকাঙ্ক্ষাজনিত অভাববোধ। মনোবিজ্ঞানের আলোয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের মধ্যে আছে এক সৃজনশীল সত্তা, যা দ্বিমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়। একদিকে শরীরী মিলনের মাধ্যমে মূর্ত এক দেহকে বহু মূর্ত দেহতে রূপান্তরিত করার আকাঙ্ক্ষাজাত অভাববোধ সক্রিয় থাকে। অন্যদিকে বিমূর্ত মননশীলতার মাধ্যমে বহুমুখী মূর্ত শিল্প সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা-জাত অভাববোধ বিরাজ করে। উভয়ক্ষেত্রেই সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাজাত অভাববোধের মূলে থাকে স্রষ্টা মানুষের এক হতে বহু হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তথা অমরত্ব লাভের বাসনা। সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাজাত এই অভাব-বোধই মানুষকে সক্রিয় রেখে সমাজকে গতিশীল রাখে।

বাস্তবে স্বভাবস্রষ্টা মানুষের সৃষ্টির এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের অর্থনীতি ও যৌননীতির মাধ্যমে। প্রচলিত সমাজের আর্থযৌনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হল সম্পদ ও সঙ্গীর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা। মানুষ যদি মূর্ত দেহ সৃষ্টির সাধনায় রত হতে চায়, তবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যৌন-নীতি। কেননা সমস্ত মানুষকে দৈহিক সৃষ্টির সুযোগ দিতে গেলে ব্যক্তিগত সম্পদ মালিকানার উত্তরা-ধিকারীর পিতৃত্বনির্ধারক বিবাহব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। আবার সমস্ত মানুষ যদি বিমূর্ত মননশীলতায় শিল্প সৃষ্টি করতে চায়, তবে বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থ-নীতি। কেননা সৃষ্টিকর্মে সকলের যোগ্যতা সঠিক-ভাবে ব্যবহৃত হলে সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং চাহিদা ও যোগানের ব্যবধান হ্রাস পেয়ে উদ্বৃত্ত ঘটবে। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানার মুনাফাসাপেক্ষ বাজারনির্ভর অর্থনীতির শর্তই হল পণ্যের চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম রেখে মুনাফা অর্জন সুনিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে মানুষের শিল্পসৃষ্টির অবাধ সুযোগে মুনাফাসাপেক্ষ অর্থনীতিই ভেঙে পড়বে।

এই অবস্থায় প্রাচ্যে গড়ে ওঠে ত্যাগবাদী দর্শন যা অধিকাংশ মানুষের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ সৃষ্টি করে এবং স্রষ্টাকে তার সৃষ্ট সম্পদ ভোগে বিরত রেখে মুষ্টিমেয় মানুষের ভোগ সুনিশ্চিত করে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শন ভোগের প্রলোভন দেখিয়ে সম্পদসৃষ্টিতে অধিকাংশ মানুষের সৃজনশীল সত্তাকে কাজে লাগায় এবং স্রষ্টাকে তার সৃষ্ট সম্পদ সংগ্রহের অর্থ-নৈতিক সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত রাখে। আপাত-দৃষ্টিতে দুটি দর্শনের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী হলেও উভয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করে। অধিকাংশ মানুষের সৃজনশীল সত্তাকে ব্যবহার করে সম্পদ সৃষ্টি করে

এবং স্রষ্টাকে তার সৃষ্ট সম্পদ থেকে বঞ্চিত রেখে মুষ্টিমেয় মানুষের সম্পদভোগ সুনিশ্চিত রাখে। মজার ব্যাপার হল—এই মুষ্টিমেয় মানুষের হাতেই থাকে অর্থনীতি, যৌননীতি ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এবং এরাই ভোগ ও ত্যাগের দর্শন সৃষ্টি ও প্রচারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা নেয়। ব্যাপক সাধারণ মানুষ যাদের মধ্যে অর্থনীতি, যৌন-নীতি, রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদির আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে আদৌ কোনও সচেতনতা নেই, তারা স্পষ্টত দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল ব্যক্তিগত ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতাসাধনের পথে মুক্তি খুঁজে চলে। অন্যদল ব্যক্তিগত ভোগের "থুড়োর কলে"র পিছনে দৌড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত কোন দলই শান্তি খুঁজে পায় না।

তাই আজ তৃতীয় দর্শনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে মানবসমাজের নতুন দর্শন। এই দর্শন ব্যক্তিগত ত্যাগ বা ভোগের দীর্ঘ প্রচলিত ধারণাকে অস্বীকার করে সম্মিলিত ত্যাগের উপর সম্মিলিত ভোগ প্রতিষ্ঠা করবে। ব্যক্তিগত ত্যাগ ও ভোগের দর্শনের ভিত্তি সম্পদ ও সঙ্গীর উপর ব্যক্তিগত মালিকানানির্ভর আর্থযৌননৈতিক ব্যবস্থাকে বাতিল করে এই দর্শন প্রতিষ্ঠা করবে সম্মিলিত আর্থযৌননৈতিক ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় স্রষ্টা মানুষের দ্বিমুখী সৃজনশীলতার ধারা অব্যাহত থেকে সমগ্র মানবসমাজের ক্রমবিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে। কায়েমি স্বার্থরক্ষাকারী ব্যক্তিগত ভোগ ও ত্যাগের দর্শন প্রসূত আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা ও প্রস্তাব বাতিল করে সম্মিলিত ভোগ ও ত্যাগের দর্শনভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো প্রবর্তনের জন্য সচেতন সমস্ত মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

শেখ মনিরুল ইসলাম
বাঁধপুর, হুগলী

৫

"স্ত্রীবুদ্ধি..."

গত অকটোবর সংখ্যার "চতুরঙ্গ"-এ (বর্ষ ৫২। সংখ্যা ৬। ১৯৯১) "স্ত্রীবুদ্ধি।..." নামক লেখাটিতে তিনটি ভুল আছে। প্রথম দুটি ছাপার। সম্ভবত লেখকের অপরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরহেতু। পৃ ৫০২, মারীয়ান ইভানস্ পড়তে হবে। ওনার পুরো নাম মারীয়ান ইভানস্ ক্রশ (Marian Evans Cross), যিনি জর্জ ইলিয়ট (George Eliot) নামে সুপরিচিতা। পৃ ৫০৩, ব্রোশ নয়; পড়তে হবে ব্রোকা (Broca), যিনি ছিলেন একজন দিশারি শারীরতত্ত্ববিদ্। তিন নম্বর ভ্রান্তিটি গুরুতর। ভুলটি মৎকৃত। পৃ ৫০২, ফিলোট্সন্ (Phillotson)-এর কথা স্ত্রী স্যু (Susanna)-র মুখে আরোপিত হয়েছে। স্ত্রী স্যু-এর মুখে জে. এস. মিলের বক্তব্য শুনে, স্বামী ফিলোটসন উদ্ধৃত কথা-গুলি বলেছিলেন। এই ভুল অমার্জনীয়। কল্যাণীয়া কুমারী সোমা দে লেখার এই ভুলটি ধরিয়ে দিয়ে যে উপকার করেছেন, তার জন্য আমি ওঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

দেবব্রত ঘোষ
নতুন দিল্লী-১১০০২৯

৬

সোমপা ইন্দ্র প্রসঙ্গ

"চতুরঙ্গে"র নভেমবর সংখ্যায় প্রাসঙ্গিক একটি চিঠি পড়ে উপকৃত বোধ করেছি। একটি প্রাসঙ্গিক উত্তর হিসাবে এ পত্র লিখলাম।

পত্রলেখক ইন্দ্র প্রসঙ্গে এবং সোমপান সম্বন্ধে যা কিছু লিখেছেন—সে বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই। তবে আমার প্রবন্ধটি শুধু আর্য বা বৈদিক সমাজ সম্বন্ধে রচিত হয় নি। সমগ্র প্রবন্ধটির রচনার

উদ্দেশ্যের একাংশও যদি পাঠকসমীপে স্পষ্ট না হয়ে থাকে, তবে তা দুঃখের বিষয়। প্রতি প্রবন্ধের একটি বিষয় নির্দিষ্ট থাকে (universe of discourse)। উপাদান নির্বাচন আর উপস্থাপন একটা যুক্তি দ্বারা সাধিত হয়। সেই যুক্তি না মানলে অতিপ্রসঙ্গদোষ (too wide) অথবা প্রসঙ্গচ্যুতি হিসাবে অংশ-বিশেষের প্রতি মনোযোগ (too narrow) দেওয়ার দোষ ঘটে থাকে। বৈদিক সভ্যতার যেটুকু ব্যাকরণে এবং পুরাণে কথিত তাতে "ইন্দ্র" শব্দের অর্থ হয় শক্তিধর (ইন্দ=শক্তি) ; তিনি পুর ধ্বংস করেন বলে পুরন্দর। পুর-সভ্যতা কথাটার সঙ্গে প্রত্ন-দ্রবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান মনে করি। যদি এ বিষয়ে খণ্ডন-যোগ্য উপাদান প্রাপ্ত হই, তবে আমার এই ধারণা-গুলিও স্বাভাবিকভাবেই অপসৃত হবে। বিজ্ঞানের নিয়মে স্বাভাবিকভাবে তাই হয়। আমার বিষয়-প্রসঙ্গে প্রয়োজন ছিল বৈদিক আর অবৈদিক উপাদান থেকে কী ভাবে বহুদেবসহ "হিন্দু" দেবসমাজ পরবর্তী কালে গড়ে উঠেছে, সেইটা দেখানো। "ইন্দ্র" সম্বন্ধেই বক্তব্য থাকলে শুধু 'সোমপান' নয়, সামগ্রিক পৌরাণিক উপস্থাপনার প্রশ্ন উঠত। ইন্দ্র এখানে প্রধান নয়, বহু দেবতার এবং বহুমতের স্বীকৃত দেবতাদের একজনমাত্র। সোমপান (Canabis Indica) ইন্দো-আর্য নুকুলেরই স্বীকৃত রিচুয়ালও বটে।

"ধর্ম" একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান (institu-tion), তারও ব্যবহারিক তাৎপর্য আছে। বিজ্ঞান এবং ধর্ম সহাবস্থান করলেও তাদের সাধনপন্থা যে একেবারে বিপরীতমুখী, তা আমার রচনায় বিধৃত প্রথম এবং দ্বিতীয় চার্টে বিবৃত আছে। বৈপরীত্য আছে বলেই "ধর্ম" নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বস্তুত অসম্ভব। তা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক ধারায় বহুবিস্তৃত ধর্মসাধনপদ্ধতিপ্রণালীর পরম্পরাশ্রিত ইতিহাস, তুলনামূলক ধর্মমতকে পরিস্থাপন (application) নিয়ে কিছু আলোচনা মাত্র এই প্রায়-দুষ্পাঠ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তা যদি কিছু যুক্তিশীল মানুষের গ্রাহ্য বলে মনে হয়, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব। "ধর্ম" নিয়ে যে আলোচনাই করি, তাকে বিজ্ঞানতন্ত্রের যুক্তির মধ্যে নিয়ে আসা এখনও অসম্ভব বলে মনে হয়। সম্ভাব্য পথিকৃৎ কেউ থাকলে তা অভিবাদনযোগ্য।

অরুণা হালদার
রাজেন্দ্রনগর, রোড-৬,
পাটনা-৮০০ ০১৬

৭

ডাকঘর নাটকের অমল কে ?

"চতুরঙ্গ" অকটোবর ১৯৯১ সংখ্যার গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে পড়লাম রণেন্দ্রনাথ দেবের "সাহিত্যবিচারে মনোবিদ্যা"র আলোচনা। বইটির ৭৭ পৃষ্ঠার প্রথমেই বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের 'অমল মাধব দত্তের একমাত্র সন্তান।'—ডাকঘর নাটকে মাধব দত্ত ঠাকুরদাকে বলেছেন, অমল 'আমার স্ত্রীর গ্রাম সম্পর্কে ভাইপো।' অমলের পুরো নাম দেওয়া আছে 'অমল গুপ্ত' এবং সে মাধব দত্তকে পিসেমশাই বলে সম্বোধন করছে। বইটি "জ্ঞানসম্পুট গ্রন্থমালা"র অন্তর্গত—যার সম্পাদক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্টতই ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদকের দায়িত্ব মন দিয়ে পালন করেন নি—না হলে এই ভ্রম থাকতে পারত না। আর শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তি, যিনি "রবীন্দ্ররচনাবলী"র (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত) সচিব ও তীক্ষ্ণধী লেখক-সমালোচক—তাঁর দৃষ্টিও এই ভ্রমটি এড়িয়ে গেল! 'নতুন পাঠককে কোনো বিষয়ে প্রবেশ করাতে গেলে' এ ধরনের ভ্রম মারাত্মক।

সুজিৎ ঘোষ
কলকাতা-২৭